বিদেশী ফুল



শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ, ১৩৪২
মূল্য দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
আইডিয়াল প্রেস
১২।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

কতটুকু জমি মানুষের দরকার?

টলষ্টয়

১

ভাগ্যক্রমে বড়বোনের বিবাহ শহরের এক ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে হইয়াছিল. সেইজন্য শহরেই তাহাকে থাকিতে হইত। কিন্তু ছোটবোনটীর বিবাহ হইয়াছিল সামান্য একজন কৃষকের সঙ্গে। তাহার ভাগ্যে শহরে যাওয়া আর ঘটিয়া উঠে নাই। একদা এহেন শহর-বাসিনী ভগ্নী পল্লী-বাসিনী ভগ্নীর বাড়ী বেড়াইতে আসিল!

চা পান করিতে করিতে বড়বোন তাহাদের শহরের গল্প করিতেছিল। বলিতেছিল; শহরে না হলে থাকা যায়, ভাই? যা খেতে চাও, তক্ষুণি পাবে। ছেলেমেয়েগুলো ভব্য হয়। তারপর থিয়েটার আছে, বেড়াবার যায়গাই বা কত! একতিল ফুর্ত্তির অভাব নেই!

এ-সব কথা ছোটবোনের যে ভাল লাগিতেছিল তাহা নহে। মনে মনে সে ক্রুদ্ধই হইতেছিল। এখন সে-ও প্রমাণ করিতে আরম্ভ করিল, শহরে ব্যবসা করিয়া যাহাদের খাইতে হয়, তাহাদের মত জঘন্য জীব আর কেউ হইতে পারে না। কৃষকের সরল অনাড়ম্বর জীবনের কাছে আর কোনও জীবন উপভোগ্য নয়।

—তোর শহরের হাজার সুবিধের জন্যেও আমি একদিনের তরে লালায়িত নই! আমাদের এই গেঁয়ো জীবন, এই ভাল। কোন ঝঞ্ঝাট নেই। জানি বটে, তোরা আমাদের চেয়ে খাস্ দাস্ পরিস্ ভাল, কিন্তু তোদের যত্র আয় তত্র ব্যয়। তোদের মতন মোটা হয়ে আমরা থাক্‌তে পারবো না বটে, কিন্তু খেতে পাবো না, এ আমাদের কখনই হবে না!

বড়বোন ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল খুব হয়েছে, গরু-ছাগলের আবার কবে খাবারের অভাব হয়? ও-সব কথা আমাকে আর শোনাস্ নে! যতই খাটো আর যা-ই করো, ঐ গোবরের গাদায় মরে পড়ে থাক্‌তে হবে—ছেলেপুলেগুলো গোবর-মাখা হয়েই থাক্‌বে! মানুষ আর হতে হবে না!

—তা হ'ক্। গোবর আমাদের মাখতে হয় সত্যি! তা নইলে আমাদের চলে না। কিন্তু তোদের শহরেও গোবরের অভাব নেই! আমাদের যা গায়ে লাগে, ধুয়ে ফেল্লে তা চলে যায়। তোদের সেখানে যে গোবরের ছাপ লাগে, দেহ ভেদ করে তা মনকে পর্যান্ত কুৎসিত ক'রে রাখে। পথের মোড়ে মোড়ে শয়তান দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে তোদের ডাকছে—মদ, জুয়া, মেয়েমানুষ এই সব নিয়েই তো, তোর শহরের লোকেরা বেঁচে আছে! তার চেয়ে এ-জীবন আমাদের ঢের ভালো, এখানে ও-সব বালাই কিছু নেই!

বাড়ীর কর্ত্তা প্যাহোম অদূরে বসিয়া সমস্ত কথাই শুনিতেছিল! স্ত্রীর কথাগুলি তাহার ভাল লাগিতেছিল। আপনার মনে সে ভাবিতেছিল; সত্যিই তো! শিশুকাল থেকে মাটি কাটতেই আমাদের দিন চলে যায়—মগজে ও-সব বদ্-খেয়াল ঢোক্‌বার অবসর হয় কোথায়? তবে আমাদের কি দুঃখু নেই? তা নয়! আমাদের একমাত্র দুঃখু—জমি নেই! ভাল জমি যদি দু'দশ একর থাক্‌তো, তা হ'লে শয়তানকেই কি ভয় করতাম!

শয়তান সেইখানেই সকলের অগোচরে উনুনের ধারে বসিয়া সকল কথাই শুনিতেছিল। শুনিতেছিল

কৃষকরমণীর দম্ভের বাণী: আমাদের এখানে ওসব বালাই নেই। শুনিতেছিল, কৃষক অর্দ্ধোচ্চারিতভাবে যাহা বলিল; ভাল জমি যদি পাই, শয়তানকে ভয় করিনে!

মেয়েদের চায়ের বৈঠক শেষ হইয়া গেল। শয়তানও উনুনের ধার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আপনার মনে কৃষককে উদ্দেশ করিয়া বলিল: তুমি যা চাও, তোমাকে আমি তাই দেবো! তোমাকে প্রচুর জমি দেবো! এত জমি তুমি তোমার কল্পনাতেও কোনদিন আশা করতে পারোনি!

২

সেই গ্রামের উপান্তেই একজন মহিলা বাস করিতেন। তাঁহার প্রায় তিনশো একরের মত জমি ছিল। চাষীদের মধ্যে তিনি সেই সব জমি বিলি করিয়া দিয়াছিলেন। ভদ্রমহিলাটী নিজে ভারী ভালমানুষ ছিলেন। চাষীদের সঙ্গে কখনও তাঁহার কোনও বাদ-বিসম্বাদ হইত না। প্রথম প্রথম কাজকর্ম্ম নিজে

সমস্তই দেখিতেন, কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি একজন গোমস্তা রাখিলেন। যিনি গোমস্তা হইয়া আসিলেন, তিনি আজীবন যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন! বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি একতিল কমে নাই। নিরীহ কৃষকদের পাইয়া তিনি বৃদ্ধ বয়সে তেজ দেখাইবার একটা উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেন। কথায় কথায় লোকদের জরিমানা করিতে লাগিলেন। প্যাহোম যতই সাবধান হ'ক না কেন, কখন যে তার গরু-ছাগল পরের ক্ষেতে ঢুকিয়া এটা ওটা খাইয়া আসিত, সে কিছুতেই ঠিক করিতে পারিত না। এবং তাহার ফলে জরিমানা তাহাকে প্রায়ই দিতে হইত।

সেই বছর শীতকালে হঠাৎ শোনা গেল যে, ভদ্র মহিলাটী তাঁহার সমস্ত জমি-জমা বিক্রী করিয়া ফেলিবেন স্থির করিয়াছেন এবং বড় রাস্তার উপরে যে সরাইখানা আছে, তার মালিক তাহা কিনিয়া লইবার মতলব করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া কৃষকদের মাথায় বজ্রাঘাত হইল, কারণ তাহারা সরাইওয়ালাকে বেশ ভাল করিয়াই জানিত। তাহার পাল্লায় পড়িলে জরিমানা দিতে দিতেই তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে।

তখন সমস্ত কৃষক সমবেত হইয়া নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া সেই ভদ্রমহিলার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। এবং সকলে নিবেদন জানাইল যে, তিনি যেন ঐ লোকটাকে জমি বিক্রী না করেন। তাহার বদলে তাহারা সকলে মিলিয়া তাঁহার জমি কিনিয়া লইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। কিন্তু কি ভাবে কেনা হইবে, তাহা লইয়া তাহাদের মধ্যে কোনও মতের মিল হইল না, অবশেষে স্থির হইল যে, যে যত পারে, সে তত কিনিয়া লইতে পারিবে।

প্যাহোম শুনিল যে তাহাদের একজন প্রতিবেশী পঞ্চাশ একর্ জমি কিনিতেছেন এবং বন্দোবস্ত হইয়াছে যে, কিনিবার সময় সে দামের অর্দ্ধেক নগদ চুকাইয়া দিবে, বাকী অর্দ্ধেক এক বৎসরের মধ্যে শোধ করিয়া দিলেই চলিবে। শুনিয়া প্যাহোমের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। এত সুবিধা থাকিতেও, সে কিছু জমি দখল করিতে পারিবে না?

বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল: দেখ সবাই জমি কিন্‌ছে! যেমন করে হ'ক, কিছু জমি কিন্‌তেই হবে—নইলে আর চলে না!

কি করিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহার জন্য

তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিতে বসিল। হাতে তাহাদের একশো রুবেল ছিল। একটা ছোট ঘোড়ার বাচ্ছা ছিল, সেটা বিক্রী করিল। সেই সঙ্গে অর্দ্ধেক মৌমাছিও বিক্রী করিল। এক যায়গায় নিজের ছেলের একটা কাজের ঠিক করিয়া সেখান হইতে তাহার মাহিনা বাবদ অগ্রিম কিছু লইয়া আসিল। বাকি টাকাটা তাহার শ্যালকের নিকট ধার করিল। এই ভাবে অর্দ্ধেক দামের যোগাড় হইয়া গেল।

একদা এক শুভদিনে দর-দস্তুর শেষ করিয়া প্যাহোম চল্লিশ একর্ জমি কিনিয়া ফেলিল।

প্যাহোম এখন নিজেই জমিদার। একজনের নিকট হইতে বীজ ধার করিয়া সে-বৎসর কাজ চালাইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এত ভাল ফসল পাইল যে এক বৎসরের মধ্যেই সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিল। সকাল বেলা নিজের জমির মধ্যে যখন গিয়া দাঁড়াইত, চারিদিকের শস্যপূর্ণ শ্যামল মাঠের দিকে চাহিয়া তাহার অন্তর আনন্দে ভরিয়া উঠিত। তাহারই নিজের জমিতে তাহারই নিজের হাতে তৈরী-করা সোনার ফসল! সে রকম ফসল যেন আর কারুর ক্ষেতে নাই!

তাহার গাছে যে ফুল ফোটে, ফল ধরে, তাহার রূপ যেন আলাদা!

৩

এই রকম আত্মতৃপ্তির মধ্য দিয়াই প্যাহোমের দিন অতিবাহিত হইতেছিল। কিন্তু কিছুদিন যাইতে-না-যাইতে এক উৎপাত দেখা দিল। প্রত্যহ রাত্রিবেলা পঞ্চায়েতের খোঁয়াড় হইতে তাহারই ক্ষেতে গরু প্রবেশ করিয়া শস্য নষ্ট করিতে লাগিল। একান্ত শান্তভাবে প্রথমে সে পঞ্চায়েতের কাছে প্রতিবাদ জানাইল। কিন্তু কোনও প্রতিবিধান হইল না। ক্রমশঃ তাহার ক্ষেতে অনধিকার-প্রবেশকারীদের সংখ্যা বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। বহুদিন পর্য্যন্ত সে এইভাবে সহ্য করিল, কিন্তু অবশেষে একদিন আদালতে নালিশ করিতে বাধ্য হইল। সে জানিত যে গোচারণভূমির অভাবের জন্যই গরু ছাগল নিরুপায় হইয়া অন্যের ক্ষেতে ঢুকিয়া পড়ে—ইহার জন্য আর কাহাকেও দায়ী করা যায় না। বহুদিন ধরিয়া সে মনে মনে এই ভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছিল।

অবশেষে সে কিন্তু স্থির করিল যে, এইভাবে সহ্য করিয়া থাকিলে সে-ই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইবে।

এইরকম নালিশ প্রায়ই আদালতে চলিতে লাগিল এবং তিন-চার জনের জরিমানাও হইল। এই সব ঘটনার ফলে প্যাহোমের সঙ্গে গ্রামের লোকদের মনান্তর ঘটিতে লাগিল।

এই সময় একটা গুজব উঠিল যে, গ্রামের বহু-লোক অন্য যায়গায় উঠিয়া যাইতেছে। সংবাদটী শুনিয়া প্যাহোম মনে মনে আনন্দিত হইল, ভাবিল, আমি আমার জমি ছেড়ে কোথাও নড়ছিনে! ওরা যদি সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, তা হ'লে বহু জমি খালি পড়বে এবং তখন খুব কম দামেই পাওয়া যাবে! আরও জমি চাই—নইলে বেশ নিশ্চিন্তভাবে থাকা চলে না।

একদিন প্যাহোম বাড়ীতে আছে, এমন সময় দরজায় একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারই মতন একজন কৃষক। সেই গ্রামের মধ্য দিয়া তাহাকে দূর পথে যাইতে হইবে। অতিথি সে-রাত্রি সেইখানেই অতিবাহিত করিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রিবেলায় প্যাহোম জানিতে

২

পারিল যে, নবাগত লোকটী ভোল্‌গা নদীর ওপার হইতে আসিতেছে এবং তাহারা যেখানে আছে, সেখানে বহুলোক গিয়া নূতন বসবাস স্থাপন করিতেছে। পঞ্চায়েতে যোগদান করিলেই পঁচিশ একর্ করিয়া জমি পাওয়া যায়—আর সে কি জমি! এক একটা যবের শীষ ঘোড়ার সমান উঁচু হয়—আর এত ঘন ঘন হয় যে, পাঁচ-কাস্তেতেই একটা পূরো আঁটি হইয়া যায়। কথায় কথায় সে জানাইল যে, একজন চাষা খালিহাতে সেখানে গিয়াছিল—এখন তাহার ছ'টী ঘোড়া এবং ছ'টী গরু!

এ-কথা শুনিয়া প্যাহোমের মন জ্বলিয়া উঠিল ; ছাই! এখানে এই ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে পড়ে থাকি কেন? যদি সেখানকার ভাল জমিগুলো দখল করতে পারি, তবে এগর্ত্তে পড়ে থাকি কেন? এখানকার জমি-জমা বিক্রী ক'রে নূতন ক'রে সেখানে গিয়েই বসবাস করবো!

কিন্তু একেবারে স্থিরসিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে সে স্থির করিল যে, আগে সে নিজে গিয়া দেখিয়া আসিবে, আগন্তুকের কথা সত্য কি না!

গ্রীষ্মকাল আসিতেই সে যাত্রা করিল। ষ্টীমারে

সে সামারা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখান হইতে আগন্তুকের নির্দ্দেশমত তিনশো মাইল পায়ে হাঁটিয়া সে গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিল! আগন্তুক যাহা বলিয়াছিল, ঠিক তাহাই! চারিদিকে অফুরন্ত জমি; প্রত্যেকেই পঁচিশ একর করিয়া জমি অমনি ভোগ করিতেছে, তাহা ছাড়া যাহাদের টাকা-পয়সা আছে, তাহারা নাম মাত্র ছু'শিলিং-এ এক একর্ জমি কিনিয়া লইয়া স্বাধীনভাবে ভোগদখল করিতে পারে।

প্রয়োজনীয় সংবাদাদি লইয়া প্যাহোম বাড়ী ফিরিয়া আসিল। জমি-জমা, জিনিষ-পত্র সমস্ত বিক্রী করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বসন্তকাল আসিতেই সপরিবারে নূতন দেশের দিকে রওনা হইল।

৪

সেখানে আসিয়া যথারীতি প্যাহোম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিল। একদিন গ্রামবৃদ্ধদের পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজ দিল এবং সেই দিনই তাহারা পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে দলভুক্ত করিয়া

লইল। তাহার এবং তাহার ছেলেদের জন্য পঞ্চায়েতের জমি হইতে পাঁচটী অংশ তাহাকে লেখাপড়া করিয়া দেওয়া হইল—অর্থাৎ সে ১২৫ একর্ জমি পাইল। যে জমি সে ছাড়িয়া আসিয়াছিল, তাহার দশগুণ জমি এখানে সে বেশী পাইল। জমিগুলাও আগেকার জমি থেকে বহুগুণে ভাল। মনের আনন্দে সে চাষবাসে মন দিল।

কিন্তু কিছুদিন যাইতে-না-যাইতে সেই দশগুণ জমি তাহার কাছে ঠিক আগেকার মতই সামান্য মনে হইতে লাগিল! প্রতিদিন যাহা ভোগ করা যায়, তাহার ঐশ্বর্য্য মানুষ ভুলিয়া যায়। প্যাহোম ভুলিয়া গেল, একদিন তাহার কত কম জমি ছিল! সেই তুলনায় আজ তাহার জমি কত বেশী হইয়াছে। কিন্তু অনবরত তাহার মনে হইত, এই সামান্য জমি লইয়া কি হইবে? নিষ্কর কতকগুলি জমি আয়ত্ত না করিতে পারিলে খাটিয়া কোন লাভ নাই।

অবস্থার উন্নতির ফলে তাহার হাতে কিছু অর্থও সঞ্চিত হইয়াছিল। সে স্থির করিল, সুবিধা পাইলেই সমস্ত টাকা দিয়া জমি কিনিবে।

এ হেন সময়ে আবার এক পথিক ঘোড়াকে জল

খাওয়াইবার জন্য তাহাদের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দূর দেশের পথিক দেখিয়া প্যাহোম তাহাকে চা পানের জন্য আহ্বান করিল। চা খাইতে খাইতে প্যাহোম গল্পচ্ছলে জমি-জমার কথাই তুলিল।

প্যাহোমের অন্তরের বাসনার কথা বুঝিতে পথিকের বিলম্ব ঘটিল না। তখন সে আপনা হইতেই জানাইল যে, সেখান হইতে বহুদূরে বাস্কিরদের দেশ আছে। সম্প্রতি সে সেখান হইতেই আসিতেছে। জমি মাটির দরে বিক্রী হয়। এবং মাত্র হাজার রুবেল দিয়া সে সেখানে তেরো হাজার একর জমি কিনিয়াছে।

প্যাহোম শুনিয়া তো অবাক! মাত্র হাজার টাকায় তেরো হাজার একর জমি!

কৌতূহলী হইয়া প্যাহোম পথিককে নানা রকমের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। উত্তরে পথিক যাহা বলিল, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে এইরূপ:

সেখানে জমি লইতে হইলে, কোন রকমে সর্দ্দারদের হাত করিতে পারিলেই হইয়া গেল! আর তাহারা খুব অল্পেই সন্তুষ্ট হয়। শ'খানেক রুবেল খরচ করিয়া সে শহর হইতে কতকগুলি ফ্যাসান মত ড্রেসিং গাউন, কার্পেট, একবাক্স চা এবং যাহারা মদ্যপান করে, তাহাদের

জন্য কিছু মদ্য লইয়া যায়—এই পাইয়াই সর্দ্দাররা এত খুশী হইয়া গিয়াছিল যে, একর্-পিছু মাত্র দু'পেনী লইয়া তাহারা সেই বিরাট জমি তাহাকে লিখিয়া পড়িয়া দিয়া দিল।

জমির দলিলখানি তাহার সঙ্গেই ছিল। খুলিয়া প্যাহোমকে দেখাইয়া বলিল: এই দেখুন, আমার জমি। নদীর ধারেই সব জমি। একটু আধটু জমি নয়, তেপান্তর মাঠের মত সব জমি পড়ে রয়েছে। কারুর বুকে লোহার ফলকের আঁচড় এখনও লাগেনি! জমি নয়—যেন কুমারী মেয়ে!

প্যাহোম সমস্ত ব্যাপার সঠিক জানিয়া লইবার জন্য প্রশ্ন করিতে লাগিল। উত্তরে পথিক বলিল: যদি আপনি একবছর ক্রমাগত হেঁটে চলে যান, তা হ'লেও সে-জমির শেষ সীমানায় পৌঁছুতে পারবেন না। এই বিরাট জমিদারী সমস্তই সেই বাস্কির-সর্দ্দারের অধিকারে। আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, বাস্কিররা, ঠিক যাকে বলে ভেড়ার মত মুখ্যু। কোন রকমে তাদের একটু সন্তুষ্ট করতে পারলে, জলের দরে জমি পাওয়া যায়।

প্যাহোম মনে মনে জপিতে লাগিল: আমার

ত আছে হাজার রুবেল। ত্রিশহাজার একর জমি যদি পাই, তবে এখানে আর পড়ে থাকি কেন ?

৫

পথিকটীর নিকট হইতে বাস্কিরদের দেশে যাইবার পথ প্যাহোম তন্নতন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিল। কালবিলম্ব না করিয়া প্যাহোম সঙ্গে মাত্র একজন ভৃত্যকে লইয়া বাস্কিরদের দেশের দিকে যাত্রা করিল। পথে একটী বড় শহরে উপস্থিত হইয়া পথিকের নির্দ্দেশমত সর্দ্দারদের খুশী করিবার জন্য সে বড় এক বাক্স চা, কিছু মদ এবং উপহার দিবার মত অন্য আরও জিনিষ-পত্র সংগ্রহ করিয়া লইল। তিনশো মাইল অতিক্রম করার পর, সাতদিনের দিন তাহারা বাস্কিরদের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

·দেখিল, পথিক যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাইতেছে। নদীর ধারে সীমাহীন তেপান্তর মাঠের মাঝখানে তাঁবু ফেলিয়া পরম নিশ্চিন্ত ভাবে তাহারা বসবাস করিতেছে।

প্যাহোমকে দেখিবা মাত্র কৌতূহলী হইয়া তাহারা

তাঁবু ছাড়িয়া প্যাহোমের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দলেই একজন দোভাষী ছিল। সে রুশভাষা জানিত। তাহার মধ্য দিয়াই আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল। প্যাহোমের জিনিষের কথা শুনিয়া তাহারা প্যাহোমকে এক বিরাট রাজকীয় সম্মান দিবার আয়োজন করিয়া ফেলিল।

উপহার দিবার জিনিষপত্র সব গাড়ীতে ছিল; গাড়ী হইতে আনাইয়া একে একে প্যাহোম বিতরণ করিতে লাগিল। আনন্দে উল্লাসে বাস্কির-সর্দ্দারের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যেন জীবনে সেই জিনিষ তাহারা এই প্রথম দেখিতেছে।

বাস্কিররা অনেকক্ষণ নিজেদের মধ্যে কি-সব কাথাবার্ত্তা বলাবলি করিল। দোভাষী-মহাশয় প্যাহোমকে বুঝাইয়া বলিল: সর্দ্দাররা বলছেন, তাঁরা আপনার উপহার পেয়ে কতদূর যে সন্তুষ্ট হয়েছেন তা বলে জানাতে পারছেন না। তাঁদের প্রথা হলো, যে-কোনও উপায়ে অতিথির সন্তুষ্টি-বিধান করা এবং অতিথির দানের পরিবর্ত্তে অতিথি যা চাইবেন, তাই প্রতিদান করা। ওঁরা সেইজন্য আপনার কাছে জানতে চাইছেন আপনি ওঁদের কাছ থেকে কী পেলে সন্তুষ্ট হবেন!

এইভাবে আপ্যায়িত হইতে দেখিয়া প্যাহোম তাহার অন্তরের কথা নিবেদন করিয়া জানাইল: এখানকার জিনিষের মধ্যে যা আমার সব চেয়ে ভাল লাগে তা হলো এখানকার আমাদের জমি। দেশের জমি-যায়গা আর পাবার জো নেই—এতো মানুষের ভিড়! তার ওপর যে-সব জমি পাওয়া যায় এতবার তা থেকে ফসল তোলা হয়েছে যে তাতে আর বিশেষ-কিছু পদার্থ নেই। কিন্তু আপনাদের এখানে এসে দেখ্‌ছি বেড়া দিয়ে ঘেরা যায় না এমন ক্ষেতের পর ক্ষেত পড়ে রয়েছে—আর মনে হয় তার মাটিতে এখনও যেন লোহার ফলার দাগ পড়েনি। জীবনে আমি আর কখনও এ-রকম জমি দেখিনি।

দোভাষী প্যাহোমের কথা বাস্কিরদের বলিতেই তাহারা সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তারপর আবার নিজেদের মধ্যে কি-সব বলাবলি করিল।

দোভাষী আবার প্যাহোমকে ডাকিয়া তাহাদের কথা বুঝাইয়া বলিল: এঁরা আপনাকে আপনার যত খুশী তত জমি দেবে—আপনাকে শুধু হাত দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে মাত্র!

এই সময় প্যাহোম লক্ষ্য করিল যে বাস্কিরদের মধ্যে

সহসা কী কথা লইয়া যেন একটা বচসা হইতেছে। যেন দলের মধ্যে তুইটী পক্ষ হইয়া গিয়াছে। একপক্ষ অপর পক্ষের প্রতিবাদ করিতেছে। দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিল যে এদের যিনি প্রধানতম ব্যক্তি তিনি এখন অনুপস্থিত। একদল বলিতেছে যে জমি দেওয়া সম্বন্ধে শেষকথা একবার তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দেওয়া ভাল। আর একদল বলিতেছে এতে পরামর্শ করার কী আছে ?

৬

বাস্কিররা এইভাবে যখন বচসা করিতেছিল, সেই সময়ে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই নীরব হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। দোভাষী প্যাহোমকে ডাকিয়া বলিল : ইনিই দলপতি।

দলপতির জন্য সবচেয়ে ভাল ড্রেসিং গাউনটী প্যাহোম তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। পরিচয় জানিবা মাত্রই সেই গাউন, পাঁচ পাউণ্ড অতিউৎকৃষ্ট চা দলপতির

সম্মুখে গিয়া নিবেদন করিল। গম্ভীরভাবে সেই সব গ্রহণ করিয়া দলপতি সর্ব্বোচ্চ আসনে গিয়া বসিলেন।

তিনি আসন গ্রহণ করিলে পর বাস্কিররা তাঁহাকে কি-সব বলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরবে সকলের কথা শোনার পর তিনি আঙ্গুল নাড়িয়া তাহাদের চুপ করিতে বলিলেন। ইঙ্গিতমাত্র তাহারা সকলে নীরব হইয়া গেল।

বাস্কিরদের মধ্যে ইনিই একমাত্র রুষভাষা জানিতেন। প্যাহোমকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন: তোমার বাসনার কথা আমি এদের কাছে শুন্‌লাম। আচ্ছা, তাই-ই হবে। তোমার যেখানে খুশী জমি নির্ব্বাচন কর—জমির কোনও অভাব আমাদের নেই!

প্যাহোম মনে মনে বিস্ময়ে ভাবে: এতো বড় বিপদের কথা! আমার খুশীমত আমি কী করে চাইবো? যে-জমি নেবো, তার একটা লেখাপড়া হওয়া চাই, তার রীতিমত দলীল থাকা চাই—তা না হলে কোন্ দিন কে বল্‌বে, ও জমি তোমার নয়, আমার! তখন আমি কি করবো?

প্রকাশ্যে সে বলিল: আপনার অনুগ্রহ-বচনে আমি পরম আপ্যায়িত হয়েছি। আপনাদের প্রচুর জমি—

আমি তার সামান্য কিছু অংশ চাই। কিন্তু আমার কথা হলো যে, সেটুকু সম্বন্ধে যেন আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। জীবন মৃত্যুর কথা তো কেউ বল্‌তে পারে না। আপনারা মহানুভব লোক—কিন্তু ধরুন, আপনারা যখন থাক্‌বেন না, আপনাদের সন্তানসন্ততিরা তো এ দয়া না দেখাতেও পারেন!

প্যাহোমের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে তিনি বলিলেন: তুমি ঠিকই বলেছ! তুমি যে-ভাবে চাও, সেই ভাবেই আমরা দেবো!

পরম অনুগৃহীত হইয়া প্যাহোম বলিল: আপনাদের এখান থেকে একজন লোকের মুখে শুনেই আমি এখানে এসেছি। তাঁর কাছে যে-রকম দলিলপত্র দেখেছিলাম, আমিও সেই রকম দলিলে লেখাপড়া চাই!

—বেশ, তাই হবে—তাতে আর অসুবিধে কি! আমাদের এখানে একজন লিখিয়ে লোক আছে। তাকে দিয়ে শহরে গিয়ে রীতিমত ভাবে দলিল রেজেষ্টারী করে আনা যাবে।

—আমাকে কি মূল্য দিতে হবে?

—আমাদের সর্ব্বদাই একদর। দিনে হাজার রুবেল।

প্যাহোম ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল: দিনে হাজার রুবেল, এ আবার কী মাপ?

তখন সর্দ্দার তাহাকে বুঝাইয়া বলিল: আমরা দিন হিসাবেই জমি বিক্রী করি। একদিনে পায়ে হেঁটে তুমি যতদূর জমি অতিক্রম করতে পারবে, সেই সব জমি তোমার হবে এবং তার দাম হবে হাজার রুবেল।

প্যাহোম চমৎকৃত হইয়া উঠিল।

বলিল: এ-ও কি সম্ভব? একদিনে তো আমি অনেক দূর হাঁটতে পারি!

সর্দ্দার হাসিয়া উঠিল। বলিল: শুধু একটী সর্ত্ত আছে। তুমি যেখান থেকে হাঁটতে আরম্ভ করবে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যদি আবার ঠিক সেই যায়গায় ফিরে আসতে না পার, তা হলে তোমার টাকা আর তুমি ফিরিয়ে পাবে না।

—সে না হয় হলো! কিন্তু কতদূর হাঁট্‌লাম, কোন্ পথ দিয়ে হাঁট্‌লাম, তার নিশান থাক্‌বে কেমন করে?

—যেখান থেকে তুমি যাত্রা করতে চাও, সেখানে আমরা সকলে সমবেত হব। তুমি শুধু সঙ্গে একটা কুড়ুল নেবে। যেখানে তুমি দরকার মনে করবে, সেখানে মাটি খুঁড়ে একটা চিহ্ন তৈরী করে রাখ্‌বে। প্রত্যেক

পথের মোড়ে এমনি করে একটা চিহ্ন রেখে যাবে তা হলেই আমরা পরে সেই সব চিহ্ন দেখে জমি মাপ করে তোমাকে দিয়ে দেব। যতদূর ইচ্ছে তুমি যেতে পার, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করবে, সূর্য্যাস্তের মধ্যে সেইখানে এসে পৌঁছানো চাই।

প্যাহোমের অন্তর অনির্ব্বচনীয় উল্লাসে ভরিয়া উঠিল। মাত্র হাজার রুবেল! তার পরিবর্ত্তে কি বিরাট জমিদারীই না তাহার দখলে আসিতে চলিয়াছে!

সেদিনকার মত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া খাওয়া-দাওয়ার পর প্যাহোমের শয্যার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বাস্কিররা যে যার তাঁবুতে চলিয়া গেল!

৭

রাত্রিতে প্যাহোমের চোখে আর ঘুম আসে না। মনে মনে ভাবে : দিনে পঁয়ত্রিশ মাইল পথ তো অনায়াসে চলে যেতে পারবো! এখনকার দিনগুলোও বড়!

মনে মনে ঠিক করিয়া লয়, সেই বিরাট জমিদারীর কোন্ অংশে সে কি কি করিবে ; হিসাব করে, নূতন বলদ, ঘোড়া, জনমজুর আরও কত বেশী লাগিবে। এইভাবে সারারাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। ভোর-বেলার দিকে সে একটু নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

নিদ্রায় কি এক অদ্ভুত স্বপ্ন সে দেখিল। মনে হইল, সে সেই তাঁবুতেই শুইয়া আছে। এমন সময় বাইরে কিসের শব্দ হইতে বাহির হইয়া দেখে যে, বাস্কিরদের সর্দ্দার হাসিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে। সর্দ্দারের কাছে আগাইয়া আসিয়া প্যাহোম প্রশ্ন করিল : তুমি এ-রকমভাবে হাস্‌ছো কেন ?

কিন্তু প্রশ্ন করিয়া উত্তরের জন্য সর্দ্দারের দিকে চাহিতেই প্যাহোম দেখিল, সর্দ্দার কোথায়! তাহার বদলে সে দেখিল, যে-লোকটি একদিন ঘোড়াকে জল খাওয়াইতে আসিয়া তাহার বাড়ীর দরজায় নামিয়া তাহাকে এইখানকার খবর দিয়াছিল, সেই লোকটাই দাঁড়াইয়া হাসিতেছে! তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল : কতক্ষণ তুমি এখানে দাঁড়াইয়া আছ ? উত্তরের আশায় তাহার মুখের দিকে চাহিতেই দেখে, তাহারই ভুল হইয়াছে—এ তো সে লোক নয়!

বহুদিন আগে ভোল্‌গার ওপার থেকে যে চাষাটা তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিল, এ সে-ই !

কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে-না-থাকিতে সে দেখিল, এবারেও তাহার দেখা ভুল হইয়াছে। তাহার সামনে যে লোকটী দাঁড়াইয়া, মানুষের মতন চেহারা তাহার নয়। তাহার পায়ে লোহার ক্ষুর, মাথায় লোহার শিং, মুখে কি বীভৎস ছায়া ! ক্ষণে ক্ষণে সে অট্টহাস্য করিয়া উঠিতেছে ! তাহারই সে অট্টহাসির শব্দে সে তাঁবুর বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ! শঙ্কিত পাদক্ষেপে তাহার একটু নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখে, সেই মৃত্যু-দূতের পায়ের তলায় খালিপায়ে কে একজন লোক অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। একটু অগ্রসর হইয়া শায়িত লোকটীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া প্যাহোম বুঝিল, লোকটীর দেহে প্রাণ নাই ! সমবেদনায় তাহার মুখের দিকে চাহিতেই বিস্মিত হইয়া সে দেখিল, তাহারই মৃতদেহ সেই ভীষণমূর্ত্তি লোকটীর পদতলে অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে !

সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

সম্মুখের খোলা দরজা দিয়া দেখিল, প্রভাতের সোনালী আলো আসিয়া পড়িয়াছে। স্বপ্নের কথা মনে

পড়িতেই সে আপনার মনে বলিয়া উঠিল : কী সব বিচিত্র জিনিষিই না স্বপ্নে দেখা যায় !

সূর্য্যোদয় হইয়া গিয়াছে, আর বিলম্ব করিয়া লাভ নাই। যত শীঘ্র যাত্রা করা যায়, তাহার পক্ষে তো ততই ভাল ! এই স্থির করিয়া সে বাস্কিরদের তাঁবুতে গিয়া তাহাদের জাগাইয়া তুলিল।

স্বপ্নের কথা একেবারে তলাইয়া গেল।

৮

বাস্কিরদের সঙ্গে লইয়া কুড়ুল-হাতে যেখান হইতে যাত্রা করা হইবে, প্যাহোম সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা ছোট্ট পাহাড়—তাহারই তলদেশ হইতে বিরাট প্রান্তর দিগন্তরে গিয়া মিশিয়াছে।

কুড়ুল দিয়া একটা গর্ত্ত করিয়া সর্দ্দার বলিল : এই চিহ্ন রইলো। এইখান থেকে তুমি যাত্রা করেছ। আর এই আমার মাথার টুপি। তোমার হাজার রুবেল আগে এই টুপীতে রাখ।

সর্ত্তমত প্যাহোম হাজার রুবেল গুণিয়া সর্দ্দারের

হাতে দিল। তারপর যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সে দাঁড়াইল।

আর কালবিলম্ব করা ঠিক নয়। এখনও সূর্য্যের তেজ প্রখর হয় নাই। এই স্নিগ্ধ প্রভাতকিরণে বহুদূর পথ অনায়াসেই চলিয়া যাওয়া যাইবে।

প্যাহোম কাঁধে কুড়ুল তুলিয়া লইল। কোন্ দিক যাইবে? পূর্ব্বদিকে রক্ত-সাগরে স্নান করিয়া সূর্য্য উঠিতেছিল। প্যাহোম স্থির করিল, সূর্য্যোদয়ের দকেই সে যাত্রা করিবে।

পাহাড় হইতে নামিয়া প্রান্তরের পথে আসিয়া সে দাঁড়াইল।

হাজার গজ চলিয়া আসার পরই একটা যায়গায় মাটি খঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া সে একটা নিশানা তৈয়ারী করিল। এ-পর্য্যন্ত সে এক রকম আস্তে আস্তেই চলিয়া আসিল। ইহার পর হইতে সে দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্যাহোম একবার ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, প্রভাতের সূর্য্যোলোকে পাহাড়টী স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, পাহাড়ের প্রত্যেকটী লোকটিকে পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে তো সে বেশী

দূর আসে নাই! আপনার মনে সে অনুমান করিয়া লইল, মাত্র তিন মাইল পথ এতক্ষণে সে চলিয়া আসিয়াছে! সে আরও দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল।

মাথার উপরে তখন সূর্য্য প্রখর হইয়া উঠিতেছিল। প্যাহোম গায়ের সার্ট খুলিয়া কাঁধে ফেলিল।

যতই সে অগ্রসর হয়, ততই দেখে আগেকার জমি-গুলোর চেয়ে সামনের জমিগুলো আরও ভাল। আরও সে আগাইয়া চলে,—তাহার বিস্মিত-বিমুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আরও ভাল ভাল জমি সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে!

মাথার উপর সূর্য্যের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল, দিবা-আহারের সময় হইয়াছে। হ'ক!

এবার প্যাহোম পা হইতে ভারীবুট খুলিয়া ফেলিল।

ভারী বুট পরিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে বড়ই অসুবিধা হয়। নগ্নপদে প্যাহোম প্রান্তরের মধ্য দিয়া দ্রুততর বেগে চলিতে আরম্ভ করিল।

. কিছুক্ষণ চলিয়া আসিবার পর আর একবার সে পিছনে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, দূরে দিগন্তরেখায় পাহাড়টী অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মনে মনে সে তৃপ্ত হইল, তাহা হইলে কিছুদূর সে আসিতে পারিয়াছে!

তখন সূর্য্য মধ্য-আকাশে উঠিয়াছে। প্যাহোম

ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একটা জায়গায় বিশ্রাম করিবার জন্য সে থামিল। থলি হইতে রুটী বাহির করিয়া খাইল। বোতলে করিয়া জল আনিয়াছিল, তাহাতে তৃষ্ণা নিবারণ করিল।

পানাহারের পর শরীরে এক অভিনব শান্তি সে বোধ করিতে লাগিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রথমে ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। তারপর আপনার মনে বলিয়া উঠিল ঃ আজ কয়েক ঘণ্টা যদি একটু কষ্টস্বীকার করি তা হ'লে আজীবন তো পরম পরিতৃপ্তি ভোগ করতে পাবো !

এই ভাবিয়া সে আবার দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল ! এতক্ষণ সে যে-পথ দিয়া আসিতেছিল, তাহা হইতে বেঁকিয়া চক্র দিবার জন্য অন্যপথ ধরিল ! সীমানার নির্দ্দেশস্বরূপ সেখানে মাটি খুঁড়িয়া একটা চিহ্ন তৈয়ারী করিল। এইভাবে জমির দু'টী দিক পরিক্রমণ করিয়া সে তৃতীয় দিকে যাত্রা আরম্ভ করিল।

তখন অপরাহ্নের সূর্য্য অন্য দিগন্ত-রেখার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। অথচ তৃতীয় দিকের পথে বেশীদূর সে অগ্রসর হইতে পারে নাই। একবার সে ভাবিল, এদিকে আর বেশীদূর অগ্রসর হইয়া কাজ নাই।

কিন্তু তার পরক্ষণেই সে আপনা হইতেই বলিয়া উঠিল : এদিকে আর খানিকটা জমি না নিলে, সমস্ত জমির চেহারাটাই যে খারাপ হয়ে যাবে!

এই ভাবিয়া সে তৃতীয় দিকে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইল। অপরাহ্নে সূর্য্যের তেজ তখন স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল।

তৃতীয় পথের সীমানায় একটা চিহ্ন তৈয়ারী করিয়া সে-এবার পাহাড়ের দিকে ফিরিল। এই পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই জমির চারিদিক পরিক্রমণ তাহার শেষ হইয়া যায়। আকাশের দিকে চাহিয়া যতদূর সম্ভব দ্রুত সে চলিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু ফিরিবার পথে যত দ্রুত সে চলিতে পারিবে ভাবিয়াছিল, তত দ্রুত সে আর চলিতে পারিল না। সারা দিনের সূর্য্যের তাপে, পথশ্রমে তাহার দেহ অবশ হইয়া আসিতেছিল। অগ্রসর হইবার সময় তত লাগে নাই, কিন্তু অবশ-দেহে ফিরিবার সময় সে দেখিল, নগ্ন পদ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক পদক্ষেপে ব্যথা লাগিতেছে।

ভাবিল, একটু বিশ্রাম করিয়া লই!

কিন্তু তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে চাহিয়া আতঙ্কে

শিহরিয়া উঠিল। সূর্য্য তো তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে না! কাহারও জন্য কোনও দিন সে অপেক্ষা করে নাই।

চলিতেই হইবে। কিন্তু দেহ আর চলে না। সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস জাগিয়া উঠিল: হায়, কি ভুলই করেছিলাম! এতদূর চলে এলাম কেন? সূর্য্যাস্তের আগে কি পৌঁছুতে পারবো?

দূরে দিক্-চক্র-রেখার দিকে একবার চায়, আর একবার চায় অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের দিকে। কোথায় সে পাহাড়?

হায়, বহু দূরপথ ফিরিতে যে বহু সময়ও লাগে!

যত আগাইয়া চলে, ততই অপরাহ্নের রৌদ্র ম্লানতর হইয়া আসে। ততই আশঙ্কা নিবিড়তর হয়—সূর্য্যোস্তের পূর্ব্বে বোধ হয় ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না!

সে দ্রুত চলিতে চেষ্টা করে। যত দ্রুত চলিতে চায়, ততই দেহ বাধা দেয়। ভার মনে করিয়া সঙ্গে যত বোঝা ছিল, একে একে পথে সব ফেলিয়া দিল; যে-কুড়ুল লইয়া মাটি কাটিতে কাটিতে গিয়াছিল, সেই কুড়ুলে ভর দিয়া কোন রকমে সে চলিতে আরম্ভ করিল।

তৃষ্ণায় কণ্ঠ, তালু শুকাইয়া আসিয়াছিল। ভার-

বোধে পান-পাত্রটীও ফেলিয়া দিয়াছিল। মনে হইতেছিল, বুকে কে যেন হাতুড়ি পিটিতেছে! চোখের সামনে আব্-ছায়া রং সব ভাসিয়া উঠিতেছে! সহসা তাহার আশঙ্কা হইল যে, এইভাবে জোর করিয়া আর কয়েক পা চলিলেই মরণ অনিবার্য্য! তবু চলিতে হইবে। সূর্য্য যে অস্ত যায়!

প্যাহোম দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কে আগে পৌঁছিবে—সূর্য্য অস্তাচলচূড়ায়, না প্যাহোম যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল, সেইখানে?

দিক-বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে ছুটিতে সহসা প্যাহোম দূরে আভাসে পাহাড়টী দেখিতে পাইল।

আরও দ্রুত সে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। সূর্য্যও তখন দিক্-রেখার শেষ-সীমানার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে পাহাড় আরও স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। প্যাহোম দেখিল—সেই পাহাড়ের চূড়ায় সেই বাস্কিররা দাঁড়াইয়া আছে। প্যাহোমের মনে হইল, তাহারা হাসিতেছে।

সহসা গতরাত্রির স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল, এমনি নগ্ন-দেহে স্বপ্নে তাহারই মৃতদেহকে সে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে!

আকুল ক্রন্দনে তাহার অন্তর মথিত করিয়া ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে ব্যাকুলতম প্রার্থনা জাগিয়া উঠিল: প্রভু, শুধু বাঁচাইয়া রাখ—তোমার অপার ভুবনে স্থানের অভাব হইবে না!

সূর্য্য তখন ধরণীর শেষ-সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্যাহোম পিছনে ফিরিয়া দেখিল, অপরাহ্নের শেষ রক্ত-রাগ-টুকুও মুছিয়া গিয়াছে। সামনে তখনও দিনের আলো নিঃশেষে চলিয়া যায় নাই।

প্যাহোম রুদ্ধ-শ্বাসে পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। শুনিল, উপর হইতে বাস্কিররা তারস্বরে তাহাকে উৎসাহ দিতেছে।

পাহাড়ের উপরে উঠিল। দেখিল, দূরে যেখানে টুপীতে সে তাহার যথা-সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে, সেখানে তখনও একটু আলো যেন ঝিকিমিকি করিতেছে।

উন্মাদের মত ছুটিয়া সে সেখানে গিয়া পড়িল।

উল্লাসে বাস্কিরদের সর্দ্দার চীৎকার করিয়া উঠিল: সাবাস্! পুরুষ মানুষ বটে! সবচেয়ে বেশী জমি তুমিই পেলে!

প্যাহোমকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য সকলে অগ্রসর

হইয়া আসিল। দেখিল, মাটিতে বুক রাখিয়া রক্তাক্ত দেহে প্যাহোম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে ঘুম আর তাহার ভাঙ্গিবে না!

সকলে মিলিয়া সেইখানে মাটি খুঁড়িয়া, যাহাতে হাত-পা মেলিয়া সে ঘুমাইতে পারে, এমনভাবে কবর খুড়িল। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ছ'ফিট জমি!

সেইখানেই তাহাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। সেইটুকু জমিই তাহার প্রয়োজন ছিল।

প্রেমের তীর্থ-যাত্রা



যখন তারা তু'জনকে ভালবেসে ভেবেছিল এই পৃথিবীই স্বর্গ, তখন তাদের সম্মিলিত বয়স ছিল মাত্র চল্লিশ বছর। যুবক অলিভিয়ে ছিল তরুণ শিল্পী, তরুণী মারিয়েৎ ছিল এক ধনী পরিবারে মাত্র একজন শিক্ষয়িত্রী।

তরুণ বয়সের প্রথম প্রেমে সকলেই যেমন ভাবে, তারাও তেমনি ভেবেছিল, এ-মিলন অনন্তকালের জন্যে —যতদিন আকাশে থাকবে চাঁদ, পৃথিবীতে ফুটবে ফুল।

তিনবছর একসঙ্গে তুই অতি-অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত তারা ইতালীতে দিন কাটালো। তিনবছর তিনঘণ্টার মত চলে গেল।

তারপর হ'লো ছাড়াছাড়ি।

একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। যে-নিয়মে ফুল ফুটে উঠ্‌লেই ঝরে পড়ে, যে-নিয়মে ফল পাক্‌লেই শুকিয়ে যায়, সেই অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মে জীবন-প্রভাতের প্রথম ফোটা প্রেম-কুসুম তাড়াতাড়ি ফুটে উঠে, তাড়াতাড়ি ঝরে পড়ে যায়।

বহু বৎসর কেটে গিয়েছে। অলিভিয়ে এখন ধনী। পুরুষরা তাকে ঈর্ষ্যা করে, নারীরা প্রেম-নিবেদন করবার আকাঙ্ক্ষায় তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

মারিয়েতের জীবনেও অনেক বৈচিত্র্য ঘটেছে। তারও পায়ের তলায় বহু পুরুষ অর্ঘ্য দিয়েছে। বহুলোক তাকে ঘিরে হেসেছে, কেঁদেছে, ফুল ছড়িয়েছে। অবশেষে এক অতি ধনী রাজ-উপাধিধারী জমিদারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের অল্পদিন পরেই সে বিধবা হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে স্বামীর বিপুল ঐশ্বর্য্য তারই করায়ত্ত হয়।

এইভাবে এগারো বছর কেটে গিয়েছে। এই এগারো বছরের মধ্যে অলিভিয়ে এবং মারিয়েতের মধ্যে আর দেখাশোনা হয়নি। অবশেষে একদিন এগারো

বছর পরে এক নাচের মজলিসে তাদের দেখা। এক-দিন মারিয়েতের সমস্ত আভরণের মধ্যে ছিল তার এলোচুলে শুধু একটী শুভ্র মল্লিকা আর বুকে শুধু একটী গোলাপ-কুঁড়ি। এখন সর্ব্বাঙ্গে তার অলঙ্কার, মণি-মুক্তা! অলিভিয়ে ভাবে কে এ নারী?

মারিয়েৎ বহুক্ষণ অলিভিয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লো! কোথায় যেন এই মুখখানি একদিন তার জীবনে অতি পরিচিত ছিল। এগারো বৎসরের ব্যবধান ভেদ ক'রে ইতালীর হ্রদের পারের সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিনগুলির স্মৃতি আব্‌ছা ভেসে উঠলো। বহুক্ষণ দু'জনা দু'জনার দিকে চেয়ে চিন্‌লো। চোখের কোণে হাসি দেখা দিল। এগারো বছর আগেকার মধু-গন্ধী ক্ষণ-মধুরতা নব-সুরভিতে স্নান ক'রে দেখা দিল।

ক্ষণস্থায়ী, তবুও কি মধুর! হৃদয়-জেগে-ওঠার প্রথম রঙ, প্রথম কুঁড়ির ঘুম-ভাঙা—ক্ষণস্থায়ী হ'ক, তবু কি অপূর্ব্ব!

কী কথা তখন বল্‌বার ছিল? কী কথা তারা বলেছিল কিছু মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, সে সময় বল্‌বার শুধু একটা কথা ছিল—তাই তারা বরাবর বলেছিল। অন্য কত কথা বল্‌বার জন্যে চিত্ত ব্যাকুল

হতো, কিন্তু বলা হতো না—শুধু হাত ধরে পরস্পারের দেহের কম্পন আঙুল দিয়ে অনুভব করতো। ইতালীর হ্রদের ধারে তারার প্রদীপ নিবে যেতো।

মারিয়েৎ অগ্রসর হয়ে হাত ধরে বল্লেঃ আবার দেখা হবে, স্বপ্নেও ভাবিনে।

নাচের মজলিশ এড়িয়ে তারা দেখে, কখন একটা নির্জ্জন ঘরে নিঃশব্দে তারা দু'জনে চলে এসেছে। অন্তরে যখন প্রেম জাগে, পা জানে তখন কোথায় আছে নির্জ্জনতা।

এগারো বছর পরে তারা আবার পাশাপাশি বসলো। বাইরে তখন নাচের তালের সঙ্গে সঙ্গীতের শব্দ আসছিল।

মিথ্যা-কথা বলবার প্রয়োজন তারা কেউই অনুভব করলো না। লঘু পরিহাসের মধ্যে তারা দু'জনেই স্বীকার করলো, তাদের প্রেমের শপথ তারা রাখতে পারেনি। কিন্তু কিছুক্ষণ লঘু পরিহাসের মধ্যেই একটা কথা সমানভাবে দু'জনার মনে ফুটে উঠলো—ভুল হয়েছে। বুকের কাছের মাণিক ছেড়ে তারা কোথায় গিয়েছিল পাথর খুঁজতে কেনই বা গিয়েছিল? কি ভুল!

মনে হলো, এগারো বছর আগে তারা যেন আঙুর নিঙড়ে সুধা তৈরী ক'রে মাটির মধ্যে রেখে গিয়েছিল। তারপর তার খবর ভুলেই গিয়েছিল। আজ হঠাৎ সেই এগারো বছরের সঞ্চিত অনাস্বাদিত সুরার সন্ধান তারা পেয়েছে! কি তার সুরভি! আকস্মিকতার মাদকতা কি তীব্র!

সেই রাত্রে স্থির হলো, প্রথম যৌবনের ভুল পরিণত যৌবনে তারা সংশোধন করবে।

আনন্দগদগদকণ্ঠে মারিয়েৎ বল্লো: দেখ, আমরা আবার মিলিত হব—কিন্তু একটা সর্ত্তে। যেখান থেকে আমাদের যাত্রা থেমেছিল, সেইখান থেকেই আবার আমরা যাত্রা সুরু করবো। আমরা দু'জনে প্রেমের তীর্থ-যাত্রায় বেরুবো সেই ইতালীতে। তারপর ফিরে এসে আমি তোমার হব—কিন্তু তার আগে নয়।

মারিয়েৎ আগেই ইতালী চলে গেল। তার অভিসারে কয়েকদিন পরে অলিভিয়ে যাত্রা করলো।

এগারো বছর আগে একদিন একজন তরুণ শিল্পী ঠিক এমনিভাবেই যাত্রা করেছিল। বিস্মৃতির অন্ধকার-ভাণ্ডার থেকে উন্মাদের মত হাতড়ে অলিভিয়ে একটী

একটী করে হারানো-দিনের রত্নগুলি মনে মনে খুঁজ্ছিল। এগারো বছর পরে এক অভিনব স্পন্দন তার অন্তরে জেগে উঠলো।

সেই ইতালী! আকাশ সেখানে চির-নীল, বাতাস বসন্ত-বিধুর—তার মধ্যে মারিয়েৎ! সেদিনকার তরুণীকে আজ যেন আবার নতুন করে পাওয়া গেল! এ কি অভিনব আবিষ্কার! এই অর্থের দাসত্ব ছেড়ে আবার শিল্পসাধনায় সে ডুবে যাবে; সোনায় আর রূপোয় মনের রং হয়ে গিয়েছিল একঘেয়ে—আবার সেখানে ইন্দ্রধনুর রঙের মায়া উঠবে জেগে।

গাড়ী চলেছে। তুরীন্…ফ্লোরেন্স…

চারিদিক এখনও ফুলে-ভরা। রাত্রি বেশ স্বচ্ছ। বাতাস গন্ধ-ভারাতুর।

সকাল-বেলা রোমে গাড়ী এসে থাম্লো। প্লাটফর্মে নাম্তেই দেখে সহাস্য-বদনে মারিয়েৎ দাঁড়িয়ে।

তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে অলিভিয়ে বলে উঠলো: মিথ্যে কথা, এগারো বছর কেটে গিয়েছে! কালই তো সখী, তোমার কাছে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম।

ঠিক আগেকার মত মধুর হেসে মারিয়েৎ বল্লো: এখন চলো, এসো এইদিকে।

একটী ভাড়াটে গাড়ী ঠিক করা ছিল। সেই গাড়ীতে তারা নগরের প্রান্তে একটা তিন-তলা বাড়ীর সামনে এলো। বাড়ীর সামনে আসতেই অলিভিয়ে বুঝতে পারলো, এই সেই বাড়ী; এইখানেই তাদের তিন বছর কেটে গিয়েছিল একদিন।

বাড়ীর ভেতর ঢুকে একটা দরজা খুলে মারিয়েৎ বল্লো: মনে পড়ে, এই ঘর?

অলিভিয়ে দেখলো, এগারো বছর আগে যে-ভাবে সে এই ঘর ছেড়ে গিয়েছিল, ঘরটী ঠিক সেইভাবে রয়েছে। আসবাব-পত্র যা যেখানে যেমন-ভাবে ছিল, ঠিক তেমনিভাবেই রয়েছে। সেই টেবিল, টেবিলের ওপর সেই গালিচার টুক্‌রো, দোয়াত উল্‌টিয়ে যাওয়াতে সেই কালীর দাগ—সেই সব ঠিক তেমনি ভাবেই রয়েছে। ঠিক আগেকার মত মারিয়েৎ সারা ঘরময় যথেচ্ছভাবে গোলাপ, চামেলী, রজনীগন্ধা ছড়িয়ে রেখেছে।

অলিভিয়ে সস্নেহে সেই সব পুরাণো দিনের স্মৃতির দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে বলে উঠলো: মারিয়েৎ, কি ভাগ্যবান্! আবার তোমাকে নিয়ে—

এই বলে মারিয়েৎকে আলিঙ্গন করবার জন্যে ব্যগ্র-ভাবে দু'বাহু বাড়ালো। মারিয়েৎ একটু সরে গেল।

চোখ ঘুরিয়ে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বল্লে : এখন না, এই দিনের আলোটুকু অপেক্ষা করো—আমাদের প্রেম-তীর্থে যাবার এই তো প্রথম আড্ডা !

অধীরভাবে অলিভিয়ে মারিয়েৎকে বাহু-বন্ধনে বাঁধ্‌বার জন্য এগিয়ে গেল।

তেমনি সুরে মারিয়েৎ বল্লো : তোমরা পুরুষ, বড় অধীর ! তোমরা পেটুক—রসকে আস্বাদ করবার জন্যে যে-ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তোমাদের তা নেই !

মনে ছিল না, এগারো বছর কেটে গিয়েছে। অলিভিয়ে সে-চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে বল্লে : তুমি দেখছি একেবারে রস-শাস্ত্রে তত্ত্ববাগীশ হয়ে উঠেছ !

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ঠিক হলো, আগেকার মতো তাইবার নদীর ধারে সেই নির্জ্জন জায়গাটায় গিয়ে ঠিক আগেকার মত তারা রান্না-বান্না করবে। সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া হবে !

মন্দ কথা নয়! খাবারের সামগ্রী সংগ্রহ ক'রে দু'জনে তাইবার নদীর ধারে সেই নির্জ্জন জায়গাটায়

উপস্থিত হলো। একটা কমলালেবুর গাছের তলায় বসে তারা তাইবারের ওপর সূর্য্যের আলোর ঝিকিমিকি দেখ্‌তো। গিয়ে দেখে কমলালেবুর গাছটা ঠিক সেখানে সেইভাবেই রয়েছে। একদিন তার গায়ে ছুরি দিয়ে অলিভিয়ে মারিয়েতের নাম লিখেছিল। খুঁজ্‌তে গিয়ে দেখে—গাছের ছালে ইস্পাতের দাগ ঠিক সেইরকমই আছে।

সেই লেখা দেখে অলিভিয়ের মন আনন্দে নেচে উঠলো। মারিয়েৎকে ডেকে বল্লো: মনে পড়ে, মারি, সেই সেদিন তোমার নাম এই গাছের গায়ে লিখেছিলাম —দেখো—

তাইবারের দিকে চেয়ে মারিয়েৎ বল্লে: হাঁ, সে দিনের কথা মনে পড়ে বইকি! ডায়নার ছবিটা আঁকা সেদিন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। ভারী সুন্দর হয়েছিল ছবিটা। তারপর মনে পড়ে, আমরা শহর ছেড়ে গাঁয়ের ভেতর বেড়াতে গেলাম—ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরলাম—তারপর তুমি—

সহসা দু'জনের মন অতীতের মধ্যে যেন ডুবে গেল। নীরবে তারা দেখ্‌ছিল, তাদের মনের চোখের সমুখ দিয়ে ছায়াচিত্রের মত একটার পর একটা অতীতের দিনগুলো

হু হু করে বয়ে চলেছে। মাথার ওপরে ইতালীর সুনীল আকাশ। লেবুফুলের মধুর লোভে মাতাল মৌমাছির গুঞ্জনে তাইবারের সেই নদী-কূল মুখরিত।

বহুক্ষণ অলিভিয়েকে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখে, মৃদু অঙ্গুলীস্পর্শে সচকিত করিয়ে দিয়ে মারিয়েৎ জিজ্ঞাসা করলো: বন্ধু, কি ভাবছো? আমার ওপর রাগ করেছ?

একটু ইতস্ততঃ ক'রে অলিভিয়ে উত্তর দিল: তা নয়, হঠাৎ আমার মনে একটা কথা জানবার ভয়ানক বাসনা হয়েছে—

—কি কথা?

—আমার জানতে ইচ্ছে করছে, এই এগারো বছরের মধ্যে তুমি আমার চেয়ে বেশী কাউকে আর ভালবেসেছ কি না?

—অলিভিয়ে, এই সময়ে এই যায়গায় আজ এ কথা আমাকে জিজ্ঞেস করা তোমার উচিত হলো?

—লক্ষ্মিটি, আমায় ক্ষমা করো! কিন্তু আমাকে এর উত্তর দিতেই হবে।

—তুমি ভারি দুষ্টু! তোমার চেয়ে কাউকে বেশী ভালবেসেছি, এ আমি মনেও করতে পারি নে!

—কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই বাড়ীতে তুমি একজনের কথা বলে ফেলেছিলে।

—সে-কথা আমি ভুলতে চাই। ওগো, সে-কথা কি এমনি ক'রে স্মরণ করিয়ে দেওয়া তোমার উচিত হচ্ছে!

মানুষের মনে কোন্ অতর্কিত মুহূর্ত্তে কৌতূহল জেগে ওঠে, কে বলতে পারে? অলিভিয়ে জিদ্ ধরে বসলো যে, সে এ-প্রশ্নের উত্তর শুন্‌বেই।

—বল, কার চুম্বন এই কপোল বেশী রাঙিয়ে তুলেছে?

—ছিঃ, অলিভিয়ে! এ কি প্রশ্ন? তুমি কি পাগল হ'লে না কি?

সাহসে ভর ক'রে অলিভিয়ে বল্লো: মনে করো না যে, ঈর্ষায় এ-কথা তোমায় জিজ্ঞেস করছি!

মারিয়েৎ মৃদু হেসে বল্লে: ঈর্ষা নয়। তা বেশ। অতই যদি তোমার শুন্‌তে বাসনা, তবে শোনো সেদিনকার আমার সব খেয়ালের কাহিনী।

হঠাৎ অলিভিয়ের মনে হলো: না, এ একান্ত রুচি-বিরুদ্ধ। যে-নারী বিনাসঙ্কোচে আত্ম-সমর্পণ করেছে, তাকে এ-সব প্রশ্ন করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। আর বিশেষতঃ

এতদিন পরে এই প্রথম মিলন। হয়ত মারিয়েৎ ব্যথা পাবে।

লজ্জিত হয়ে অলিভিয়ে বল্লে: না থাক্, মারিয়েৎ, সে সব কথা! আজকে এখানে অন্য লোকের কথা বলে আর কাজ নেই। আমার উদ্ধত প্রশ্নের জন্যে আমায় ক্ষমা করো।

মারিয়েৎ স্বস্তির সঙ্গে অলিভিয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। হাতটী বুকের কাছে ধরে আপনার খেয়ালে অলিভিয়ে গল্প করতে লাগলো প্যারীর কথা, সেখানকার থিয়েটারের কথা, নাটক, নাচ, বড় বড় লোকের কথা!

তাইবার তখন সূর্য্য-কিরণে তেমনি নিঃশব্দে বয়ে চলেছিল—ঠিক এগারো বছর আগে যেমনি চল্‌তো।

কিন্তু এগারো বছর পরে পুনর্মিলিত সেই দু'টী প্রেমিক কথার আড়ালে দু'জনে দু'জনকে দেখতে লাগলো।

মারিয়েতের মনে হলো, সে শিল্পী-অলিভিয়ে আর নেই। যে-মন সব জিনিস সহজ আনন্দে গ্রহণ করতো,

তা সন্দেহবাদী হয়েছে। অতি-ভোগে বহু জিনিসের স্বাদ তার চলে গিয়েছে। যে আবেগ এই তাইবারের জল-ধারার মত সদা প্রবহমান ছিল, তা যেন মন্থর!

অলিভিয়ের মনে হলো, সে সদ্য-জাগ্রত কিশোরী কোথায়—যে বুকে করে ভায়লেট-ফুল লুকিয়ে রেখে ভাবতো, জগতের সব-চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য সে বুকে লুকিয়ে রেখেছে। কোথায় সেই অবুঝ কিশোরী?

আহারের পর তারা আবার শহরে ফিরলো। র‍্যাফেল আর মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর পুণ্য হস্ত-স্পর্শে-পবিত্র পোপের প্রাসাদে তারা নিত্য আসতো। সেইখানে অতীতের সেই দুই অতুলনীয় চিত্রকরের ছবির তলায় দুই তরুণ-তরুণী অপূর্ব্ব শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে পরস্পর ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে বসতো। আজও তারা সেখানে গেলো; কিন্তু কিছুক্ষণ ঘোরবার পর মনে হলো, যেন তারা অনর্থক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাইকেল এ্যাঞ্জেলো আর র‍্যাফেলের ছবি সেই তো মাথার ওপর তেমনি রয়েছে।

বহুক্ষণ তারা পাশাপাশি ঘুরলো। কিন্তু কারুর

মুখে কোন কথা নেই। বিস্মিত হয়ে মারিয়েৎ জিজ্ঞেস করলো: কই, এসব দেখে তুমি তো কিছু বল্লে না।

—কি শুন্‌তে চাও তুমি আমার মুখে। এ-সব দেখে আমার যা মনে হয়, তা যদি বলি, তুমি শিউরে উঠবে। এ-সব আর তেমন সুন্দর বলে মনে হয় না।

—কি আশ্চর্য্য। আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছিল। পাছে তুমি কিছু মনে করো বলে কিছু বলিনি। আচ্ছা, তখন আমরা খুব বোকা ছিলাম, না?

—তা হতে পারে...

মারিয়েৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে: কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছিল সেই সঙ্গে, জানো? বোকা থাকাই ভাল। সুন্দরের স্পর্শে এসে এ-রকম উদাসীন থাকার চেয়ে বোকা হয়ে থাকা ঢের ভাল!

অলিভিয়ে বক্র-দৃষ্টিতে একবার মারিয়েতের দিকে চাইলো। মুখে কোন কথা বল্লো না।

শহর ছাড়িয়ে তারা দু'জনে পল্লীর দিকে অগ্রসর হলো। আগে এই সব যায়গায় বেড়াতে বড় ভাল লাগতো! তারা কল্পনা করেছিল, অতীতের স্মৃতি-ভরা

রোমের এই সব পল্লীর একধারে একটী কুটীর বেঁধে তারা থাক্‌বে। গাঁ থেকে বেড়িয়ে ফেরবার পথে আগে মারিয়েৎ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে পথ চলতো! অলিভিয়ে এক-একটী জীর্ণ স্মৃতি-স্তম্ভ দেখে উত্তেজিত হয়ে তার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে অনর্গল বকে যেতো। এক-একটা পুরাণো ভাঙ্গা বাড়ীর পাথরে পদধ্বনি বেজে উঠলে অলিভিয়ে চমকে উঠতো—বলতোঃ হাজার বছর আগেকার ঘুমন্ত শব্দের সারা পাচ্ছ, মারিয়েৎ!

আজ কিছুদূর গিয়েই তারা দু'জনেই আবার শহরের দিকে ফিরলো। দু'জনের মুখেই ক্লান্তির চিহ্ন। হাজার বছরের আগেকার পাথর তেমনি পড়ে আছে। কিন্তু আজ তার শব্দ শোন্‌বার মন মরে গিয়েছে।

হেসে মারিয়েৎ বলে উঠলোঃ মনে পড়ে অলিভিয়ে, আমরা ভেবেছিলাম—এইখানে থাকবো! উঃ! এখানে মানুষ বাস করতে পারে?

ধীরে অলিভিয়ে উত্তর দিলঃ আজ যে তুমি প্যারী শহর দেখছ!

হঠাৎ দেখে দু'টী ফরাসী যুবক, সঙ্গে গুটী তিনেক মেয়ে, সেদিকে আসছে। কি উল্লাস তাদের মনে! নাচতে নাচতে তারা যেন চলেছে। এক-একটী ভাঙা

বাড়ী পার হচ্ছে—যুবক দু'টি গান গেয়ে, কবিতা আবৃত্তি ক'রে সেই সব যায়গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। যুবতীরা উল্লাস না রাখতে পেরে, হঠাৎ সেই নির্জ্জন পথের মধ্যে খানিকটা উল্লসিত নৃত্যে এ ওর ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে।

মারিয়েৎ আর অলিভিয়ে একদৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর নীরবে তারা দু'জনে দু'জনার চোখের দিকে চাইলো! সে দৃষ্টির অর্থ—এগারো বছর আগে আমরাও এই রকম ছিলাম!

সন্ধ্যার দিকে তারা বাড়ী ফিরে এলো। রাত্রির আহারের পর মারিয়েৎ পিয়ানোর সামনে গিয়ে বস্‌লো। অলিভিয়ে জিজ্ঞাসা করলো: সেই গানটা তোমার মনে আছে মারিয়েৎ—যেটা রোজ না গাইলে তোমাকে শুতে যেতে দিতাম না?

কোন কথা না বলে মারিয়েৎ পিয়ানোয় সেই গানটা বাজাতে আরম্ভ করলো। অলিভিয়ে বিস্মিত হয়ে ভাবলো: ওঃ, কি কৃত্রিম ওর সুরটা। বাজাতে বাজাতে মারিয়েতের মনে হলো: এই গান দিনের পর দিন সে কি ক'রে বাজিয়েছে।

—কেমন লাগ্‌লো, অলিভিয়ে?

৭

—বেশ ! বাজাতে তোমার ভালো লাগলো না ?

—নিশ্চয়ই !

দু'জনেই বুঝলো, দু'জনে মিথ্যে কথা বল্‌ছে।

দু'জনে রাত্রে যে-ঘরে শয্যা-গ্রহণ করতো, সেইঘরে ঢুকেই অলিভিয়ে ব্যগ্রভাবে মারিয়েৎকে আলিঙ্গন করবার জন্যে অগ্রসর হলো। মারিয়েৎ অলস-ভাবে হাত দু'টী এগিয়ে দিয়ে বল্লো ঃ আজ না, বন্ধু। আমি বড় ক্লান্ত আজ...

পাশের ঘরে অলিভিয়ের শয্যা পাতা হয়েছিল। সে সেই ঘরে গিয়ে শু'লো।

পরের দিন সকাল-বেলা অলিভিয়ের উঠতে একটু বিলম্ব হলো। পাশের ঘরে উঠে গিয়ে দেখে—মারিয়েৎ নেই! শয্যায় একখানা চিঠি রয়েছে। চিঠিতে লেখা ঃ

"তুমি যখন এই চিঠি পাবে, যখন আমি বহুদূরে চলে গিয়েছি। শুক্‌নো গোলাপকে আর জল দিয়ে ফুটিয়ে তোলা যায় না। পুজোর ফুলের মতো তাকে সযত্নে নিভৃত যায়গায় তুলে রেখে দিতে হয়। সেই তার সব চেয়ে বড় সম্মান। আশা করি, কালকের ব্যাপারে তোমারও তাই মনে হয়েছে। ইতি মারিয়েৎ।"

ফরাসী গল্প-সাহিত্য হইতে

মৃত অরণ্যানী

হ্যাঁ গা, ওঠ না! মদ খেয়ে মড়ার মত পড়ে আছ। আর আমি বাঁদীর মত খেটে খেটে মরি! পোড়া কাজেরও কামাই নেই। র‍্যাফেল এই এল বলে'। সে এসে বাঁধা-গোছায় আমার সঙ্গে হাত লাগাবে'খন। একবার ওঠ না—হ্যাঁ গা—

স্বামী মদ খাইয়া বেহুঁস অবস্থায় খড়ের গাদায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল। স্ত্রী আসিয়া তাহাকে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্বামী উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, দূর হ মাগী—

এবার স্বামীটি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইল।

মাগো! কি করি। জিনিষ-পত্তর সব বাইরে টেনে আনতে হবে, তা না হলে গাড়ী বোঝাই হবে কি করে? এখনও ময়দাগুলো বস্তায় তোলা হয় নি—আলুগুলো ভাঁড়ার থেকে বের করতে হবে। মাগো, কি হবে?

কত কাজ পড়ে রয়েছে! পোড়া পায়েও আর জোর পাই না। উনি কোথায় আমাকে একটু সাহায্য করবেন, না পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন!

বিফলমনোরথ হইয়া স্ত্রী আরো সজোরে ও ক্রুদ্ধ স্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, উঠলে না? ভাল হবে না বলছি!

স্বামী তেমনি ঘুমাইতে ঘুমাইতে অলসভাবে উত্তর করিল, দূর হয়ে যা আমার কাছ থেকে—

তারপর উপুড় হইয়া খড়ে মুখ গুঁজিয়া অসাড় হইয়া রহিল। স্ত্রীর অশ্রু ও মিনতি বিফল হইয়া গেল।

স্ত্রী ঘরের আসবাব-পত্র বাহিরে টানিয়া আনিয়া দেওয়ালের ধারে গোছাইয়া রাখিতেছিল। একটা দেবমূর্ত্তির ছবি সযত্নে কাগজে মুড়িতে মুড়িতে সে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিল, হায় রে পোড়া কপাল! সেই ছেলেবেলায় কবে বাপ-মা'র কোল হারিয়েছি। আর আজ ভিখারিণীর মত ঘরদোর ছেড়ে কোথায় চলেছি—আর এই-কি সময় ঘর ছাড়বার? এই দারুণ দুর্য্যোগে মানুষ যে কুকুরটাকেও দূর ক'রে দিতে

পারে না। হতভাগী চাষার মেয়ে, কেই-বা তাকে দেখে!

উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে বনের ধারে কর্দ্দমাক্ত পথের দিকে চাহিল। বনে তখন গাছকাটা স্নুরু হইয়াছে। র‍্যাফেল না আসিলে কেই-বা তাহার জিনিষ-পত্র গাঁয়ে পোঁছাইয়া দিবে? সে আর-একবার পথের দিকে তাকাইল। কিন্তু পথে কোনও মানুষের দিশা নাই—শুধু জমাট কুয়াশা আর ঘোলাটে পুকুর চোখে পড়ে।

উঠান হইতে সে একবার তাহার পরিচিত কুটীর খানির দিকে চাহিল। দীর্ঘশ্বাসে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। তারপর ধীরে-ধীরে সে ঘরের পিছনে গরুটাকে দেখিতে চলিল।

ইহারই মধ্যে সে ঘরের সামনে জিনিষ-পত্র অনেক টানিয়া বাহির করিয়াছে,—একখানা মই, একটা হলদে রঙের ফুলের সাজি, দু'একটা লাল ফুলও তার মধ্যে আছে, কতকগুলো ভাঙা চেয়ার, একটুক্‌রো নীল টেবিল-ঢাকা কাপড়, দু'একটা বেঞ্চি, একটা ছোট টেবিল, টেবিলটার উপরে মাল্যবিভূষিত একটি ক্রুশ, কতকগুলো ফুল, দু'এক পোঁট্‌লা আলু, খড়ের দুটো বিছানা—এই

সমস্ত এলোমেলো জিনিষের মাঝখানে মাটির উপরে একটি বৃহদায়তন কৃষ্ণবর্ণের শূকর শুইয়া আছে, শূকরটার পা গাছের সঙ্গে বাঁধা।

গরুটিকে আদর করিতে করিতে সে ডাকিল, ও আমার স্নুবলা! স্নুবল!

স্নুবলা গলাটি বাড়াইয়া দিয়া পালয়িত্রীর উন্মুক্ত অঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি স্নুবলার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বাড়ীর সামনে মুরগীগুলার তদারকে গেল।

মুরগীগুলোকে এক জায়গায় জড় করিবার জন্য প্রথমে সে এক মুঠা কড়াই ছড়াইয়া দিল। তারপর একে-একে ডানা বাঁধিয়া তাহাদের ঝুড়িতে পুরিল।

আবার সে ফিরিয়া পথের দিকে চায়···

গ্রামের দিক হইতে একটি বালিকার রেখা-মূর্ত্তি সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া মনে হইল।

জোর-গলায় মা ডাকিল, ছুটে আয়—ছুটে আয় রাক্ষুসী!

মেয়েটির পায়ে কিছু ছিল না ; সারা গা এমনভাবে ঢাকা যে, শুধু তাহার মুখের একটুখানি মাত্র দেখা যায়। মুখখানি শীতার্ত্ত ও মলিন।

তাড়াতাড়ি সে মায়ের সম্মুখে বুকের কাপড়ের ভিতর হইতে এক বোতল ব্রাণ্ডী, কয়েকখানা রুটি ও একটা মাংসের কৌটা বাহির করিয়া দিল।

এতক্ষণ কোথায় ছিলি, রাক্ষুসী ! বলি, আড্ডা দেওয়া হচ্ছিল কোথায় ?

বটে ! কি রকম জোরে বৃষ্টি নেমে এল দেখ্‌লে না ? আমি কুকুরের মত ছুটে ছুটে আসছি,—উনি বলেন কি না আড্ডা !

শীতে মেয়েটির হাত-পা কালো হইয়া গিয়াছিল। সে জোরে জোরে হাত-পা ঘষিতে লাগিল।

আড্ডা দিয়ে আসা হ'ল—আবার কথা !

বলিয়াই মাতা কন্যার পৃষ্ঠদেশে যথোচিত পুরস্কার বর্ষণ করিল।

ক্ষুব্ধ হইয়া মেয়েটি উনানের একপাশে গা-হাত-পা গরম করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিল। উনানে তখনও দুই-একটি কয়লা লাল হইয়া জ্বলিতেছে।

ও-ধারে মা আবার ঘরের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ঘরের আর-সব আস্‌বাব-পত্র সে একে-একে বাহিরে আনিয়া ফেলিল। ঘরের সাম্‌নের একটা খোলা জায়গা পার হইয়া কয়েক-গাছি তৃণগুচ্ছ তুলিয়া লইয়া সে সুবলার মুখে দিল। তাহার পং উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল সে দুই হাতে মুছিয়া ফেলিল।

সহসা সে থামিয়া দাঁড়াইয়া, দুই হাতে মাথা চাপিয়া বলে, হা ভগবান! হা ভগবান!

ভয়ে ও বেদনায় তাহার অন্তর ঘন ঘন দুলিয়া উঠে। সে ভাবিয়া পায় না—কেমন করিয়া এত দিনের এই ভিটে-মাটি আজ সে ছাড়িয়া যাইবে···

স্বামীটি তখনও শুইয়া ছিল, তবে সে মাঝে-মাঝে এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিল; আর আরক্তিম চক্ষু দুইটি রগড়াইয়া আরও আরক্তিম করিতেছিল। এত জোরে তাহার দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছিল যে, তাহার কুকুরটি ছুটিয়া তাহার পাশে আসিয়া জামা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন প্রভুর মন ফিরাইতে পারিল না তখন সে ধীরে ধীরে উনানের ধারে

প্রভু-কন্যার পাশে শুইয়া জ্বলন্ত কয়লাগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

র‍্যাফেল যখন দুটি মুমূর্ষু ঘোড়াসুদ্ধ গাড়ী লইয়া আসিল তখন রাত্রির ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে।

তিনিই মঙ্গলময়!—বলিয়া র‍্যাফেল বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

স্বামী শয্যা হইতে উঠিয়া অভিবাদন করিল,—তিনিই মঙ্গলময়—যুগ হ'তে যুগ…! এসেছ ভাই, ধন্যবাদ!

ওসব কিছু নয়! তবে বাইরে দুরন্ত বৃষ্টি নেমেছে। রাস্তা-ঘাট তো কাদায় ভরে গেছে। হাড়-কাঁপানো হাওয়া বইছে।

তা—আমাদের যদি ভোরবেলা গাঁয়ে পৌঁছোতে হয় তা হ'লে এখনই রওনা দিতে হয়।

র‍্যাফেল ঘরের এককোণে ছড়িটি রাখিয়া একবার দুই হাত বেশ করিয়া ঘষিয়া লইল, তারপর উনানের কাছে গিয়া ফুঁ দিয়া ছাই উড়াইয়া এক টুক্‌রো জ্বলন্ত

কয়লা নিবে-যাওয়া পাইপে ভরিয়া লইল। তখনও ঘরের মধ্যে একটা কাঠের সিন্দুক পড়িয়া ছিল। র‍্যাফেল তাহার উপর বসিয়া পাইপ্ টানিতে লাগিল।

গৃহস্বামিনী জানালার উপর রুটি, বোতল আর মাংস আনিয়া দিয়া স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, তোমরা দুজনে খেয়ে নাও!

মাংস ও মদের গন্ধে স্বামী সজাগ হইয়া বলিল, তোমার এত কষ্ট করবার কি দরকার? এস র‍্যাফেল,—

তারপর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া গৃহস্বামী বলিল, তুমিও এস, একটু কিছু খেয়ে নাও,—

গৃহস্বামিনী পিছন ফিরিয়া আড়ালে করিয়া সামান্য পান করিল। কৃষাণ দুইটি পূরামাত্রায় আহার করিতে লাগিল।

জমিদার এই বন বিক্রী করেছে শ্যাম্পেনের পয়সার জন্যে; আমাদের শ্যাম্পেন না জুটুক—ব্রাণ্ডীতেই চল্‌বে। কি বল?

তা তো সত্যি। কিন্তু আজ থেকে আমাদের সবই কিনতে হবে—একটা ছড়ির দরকার হ'লে তাও কিনতে হবে।

র‍্যাফেল আপন-মনে আবার বলিয়া চলিল, যতক্ষণ

পর্য্যন্ত বনটা তার গাছপালা নিয়ে বেঁচে ছিল—ততক্ষণ কিসের ভয় ছিল? সুখে হোক, দুঃখে হোক, শুক্নো ডাল কুড়িয়ে আগুন জ্বালা তো যেতো, গাছে তো ফল ছিল—চাও তো দুটো-একটা পাখী কিংবা খরগোস মারো! আজ আর তা হবে না। বরাত, পোড়া বরাত!

যাক্, আর একবার গেলাস ভরে দাও। বুরেক্! আয় ব্যাটা কুকুর, এই মাংস খা। খুব আহ্লাদ, না—রে? তোর মনিব আজ বিশ বছরের নোক্রীর পর পথে দাঁড়াল—

কুকুরটি একবার বীভৎসভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, যেন সে তার মনিবের কথা বুঝিতে পারিয়াছে।

গৃহস্বামিনী তখন দরজার উপর দেহের ভর দিয়া কাঁদিতেছিল।

র‍্যাফেল ধীরে-ধীরে বলিল, যাক্, একবারের বেশী তো আর মরতে হয় না! যার নৌকায় চলেছি, সে যদি না চায় তবে মাঝদরিয়াতেও নেমে যাওয়া ভাল!

পাইপ্‌টা ঠুকিয়া সেটাকে পরিষ্কার করিতে করিতে র‍্যাফেল বাহিরে চলিয়া গেল। তারপর তাহারা সকলে মিলিয়া জিনিষপত্র গোছাইতে লাগিল। নীরবে কেহ

কাহারও দিকে চাহিল না। গোছানো শেষ হইলে র‍্যাফেল দড়ি দিয়া সব বাঁধিতে লাগিল। গৃহস্বামিনী তখন বাড়ীর ভিতর গিয়া গরুটিকে লইয়া আসিয়া মেয়ের উপর লইয়া যাইবার ভার দিল।

মেয়েটি বেশ করিয়া কাপড়ে গা-হাত-পা ঢাকিয়া গরুটিকে লইয়া পথে নামিল। ভাষাহীন জন্তুটি বাধা দিল। কুটীরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মেয়েটিকে ঘিরিয়া সে চীৎকার করিতে লাগিল। র‍্যাফেল ডাকিয়া বলিল, তা হ'লে এইবার চলি—

গৃহস্বামী উত্তর দিল, হাঁ চল।

তবুও সে একবার হঠাৎ বাড়ীর ভিতরে চলিয়া আসিল। তাহার পিছনে তাহার স্ত্রীও আসিল। তাহারা দুইজনে দুইজনের দিকে মৌন বিষাদে চাহিয়া রহিল। অকারণে মেঝের খড়গুলি একবার তুলিয়া ফেলিল— উদাসভাবে দেয়ালটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল—বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তটিকে কেমন করিয়া এড়ান যায়?

র‍্যাফেল ডাকিয়া বলিল, অন্ধকার ঘনিয়ে আসে—চলে যাওয়া যাক্।

স্বামী স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া বলিল, চলো—যাই—ভারী বিশ্রী এ-সব তবে হয় ত আবার সব বদলে যাবে—

কথা শেষ করিয়া সে তার স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া সজোরে পিছন হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তুমি ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজমান—তুমি পিতা, তুমি সন্তান, তুমি অধিদেবতা, তোমারই জয় হ'ক।

গৃহস্বামী 'ওভার-কোটটি গায়ে বেশ টান করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া দাঁতে দাঁত লাগাইয়া পথে নামিয়া আসিল। পিছনে স্ত্রী তাহার শূকরটি টানিয়া লইয়া আসিতেছিল। চোখে অশ্রু!

গৃহস্বামী বনের ধারের পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। পথের পাশে মৃত অরণ্যানীর কঙ্কালের মত রাশীকৃত কাষ্ঠ। তাহার সর্ব্ব অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। এই বনের সে প্রত্যেক পায়ে-চলা পথটি চিনিত—এর প্রত্যেক গোপন কক্ষটি যে তাহার জানা ছিল। জীবনের

সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া সে এই অরণ্যানীর সেবা করিয়াছে। সেবার অন্তরালে কখন্ অজ্ঞাতে সে এই বনানীর সহিত বাঁধা পড়িয়াছিল। দীর্ঘজীবন ধরিয়া ঐ লুপ্তপ্রায় বৃক্ষগুলি দিনের পর দিন ঝড়, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুতের আঘাত নীরবে সহিয়া বাঁচিয়া ছিল, কিন্তু আজ প্রমাণ হইয়া গেল যে, বজ্র আর বিদ্যুতের চেয়েও তীব্র লৌহের কুঠার। তাই আজ লৌহের আঘাতে বনানীর হৃদ্-স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে। কাদায় চলিতে চলিতে সে একবার মজুরদের হাতের কুঠারের দিকে চায়, আর একবার কাঠ-ভরা গাড়ীগুলির দিকে চায়। চোখে তার হতাশ উন্মাদনা জাগিয়া উঠে। তাহার মনে হইতেছিল যে, লৌহের এক-একটি ঐ আঘাত তাহারই অঙ্গের উপরে পড়িয়াছে। লৌহ তাহার অন্তরাত্মাকে আঘাত করিয়াছে।

তাহার সাধ হয় চীৎকার করিয়া সে পৃথিবীর সকলকে এই বেদনার কথা জানায়, কিন্তু নিরুপায় হইয়া কোনও রকমে নিজেকে পড়িয়া যাওয়া হইতে বাঁচাইবার জন্য সে আবার দাঁতে দাঁত লাগাইয়া চলিতে সুরু করে।

ক্রমশঃ বৃষ্টিধারা আরও শীতল হইল। বর্ষা ভীষণতর হইয়া আসিল। পথপ্রান্তে লুণ্ঠিত দুর্ব্বল শাখাশিশুর পীত-

গৌরবের শেষ নিদর্শনপত্রগুলি ঝরিয়া পড়িয়া রহিল; অদূরে কোথাও নগ্ন দেওদার-বৃক্ষের পত্রপল্লবহীন চূড়ায় বসিয়া একপাল দাঁড়কাক চীৎকার করিয়া বিলাপ করিয়া উঠিল, হায়, আজ হতে নীড় বাঁধা হবে কোথায়!

গোধূলির ম্লান ছায়া আর মুমূর্ষু অরণ্যানীর নিরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল। সেই মৃত্যু-মলিন গোধূলি, ভয়াবহ অন্ধকার ও জ্বালা লইয়া কৃষকের অন্তরে প্রবেশ করিল। রাগে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, পথের ধারের ইটগুলিকে চিবাইয়া সে খাইয়া ফেলে। কিন্তু ভয়ে সে চোখ বুঁজিয়া চলিতে লাগিল, পাছে মর্ম্মন্তুদ আরও কিছু চোখে পড়ে।

জীবনে মৃত্যু তো শুধু একবার দেখা দেয়—বলিয়া সে সজোরে কতকগুলি শুক্‌নো ডালে লাথি মারিল। তারপর বিশ্রামের জন্য সে একটি ওক্ গাছের তলায় গিয়া বসিল। এই গাছটিতে লৌহের আঘাত এখনও পড়ে নাই, কেন না ইহার অঙ্গে দেব-মূর্ত্তি আছে। প্রতিদিন এই ওক্ গাছ পর্য্যন্ত সে বন পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিত। এই গাছটিই বনের শেষ সীমানা। এইখান হইতে প্রতিদিন সে ফিরিয়া ঘরে গিয়াছে—

আজ এই পবিত্র বনাঙ্গন ছাড়িয়া সে চিরকালের তরে চলিল। এ কি নির্ব্বাসন! হায়, মৃত্যু যদি হয়, যদি মৃত্যু হয়…

কৃষাণ বেদনায় শিশুর মত ভাষাহীন ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

স্ত্রী ডাকিল, ওগো, চলে এসো শীগ্‌গির!

র‍্যাফেল যে আর দাঁড়াইতে পারে না! রাত্রিও গাঢ় হইয়া আসিল।

সে চীৎকার করিয়া উঠিল, দূর হও—নইলে মেরে ফেলবো এখনই!

জ্বালা বোঝাই ক'রে মদ খাওয়া হয়েছে; এখন বুঝি পথেই পড়ে থাকতে হবে?

চলে যাও, বলছি। নইলে ভাল হবে না।

তা হ'লে আমি যাই। তুমি রইলে।—বলিয়াই স্ত্রী ধীরে স্বামীর নিকটে গিয়া ক্রন্দন-স্ফীত আরক্তিম দুই চক্ষু তুলিয়া জামার হাতা ধরিয়া টানিয়া বলিল, এসো, এসো!

যাও, যাও বলছি, নইলে মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবো। যাও—

স্ত্রী জামা আরও জোরে টানিল। কৃষক এইবার

উঠিয়া দাঁড়াইল। একটা শুক্‌না ডাল দিয়া স্ত্রীকে জোরে আঘাত করিয়া টানিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। তারপর নিজে সে শূকরের দড়িটি লইয়া পথ চলিতে লাগিল। স্ত্রী উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পিছু পিছু চলিল।

অচিরে অন্ধকারে আর নিশীথের কুয়াশায় তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল। শুধু অন্ধকারে দাঁড়কাকের তীব্র আর্ত্তনাদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। ক্বচিৎ দুই একটি গরু মাঠ হইতে ঘরে ফিরিতেছিল। অন্ধকারে তাহাদের গলার ঘণ্টার শব্দ ও তাহার সহিত রাখাল-বালকের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল।

তারপর সমস্ত নীরব হইয়া আসিল। তিমির-গম্ভীর ধরণীকে মনে হইতেছিল যেন শুধু একটা গতিহীন, অন্ধ, মলিন, তনুহীন তরল অন্ধকারের পুঞ্জ...

মাঝে মাঝে শুধু সেই পুরাণো ওক্ গাছটী দুলিয়া দুলিয়া অন্ধকারে শুষ্ক পত্র ঝরাইতেছিল। মৃত্যু-মথিত অরণ্যানীর ব্যথিত অন্তর হইতে শুধু একটী নিরুদ্ধ মর্ম্মর-ধ্বনি উঠিতেছে।

হায় মৃত অরণ্যানী, হায় মৃত অরণ্যানী!



ম্যাদাম বোভারী

নভেলের ইতিহাসে গোস্তাব ফ্লবেয়ারে অমর উপন্যাস "ম্যাদাম বোভারী" একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতার যে ধারা 'জোলা' এবং জোলার মন্ত্র-দীক্ষিত সেই-সময়কার ফরাসী সাহিত্যিকদের মধ্য দিয়া আজ নানা সাহিত্যে নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে—তাহার আদি-উৎস বলা যায়—এই উপন্যাসখানিকে। জোলা, দদে, প্রমুখ বৈজ্ঞানিক-বস্তুতান্ত্রিকতার প্রবর্ত্তকগণ ফ্লবেয়ারেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

নানা কারণে 'ম্যাদাম বোভারী' সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটা সমস্যা মাঝে মাঝে দেখা যায়। যখনই যুগান্তকারী একটী প্রতিভা জন্মগ্রহণ করেন—অথবা যখনই এইরূপ যুগান্তকারী কোনও সাহিত্যিকের

সাহিত্যের মধ্য দিয়া একটা বিশেষ ধারা, আদর্শ বা লিখন-পদ্ধতি পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখনই সেই সময়কার অন্যান্য লেখকের সাহিত্যও তাঁহার প্রভাবে আর তেমন বলশালী হইয়া উঠিতে পারে না। একটী পরিপূর্ণ প্রতিভার প্রদীপ্ত শিখার চারিদিকে তখন অন্যান্য অল্পেতর প্রতিভাগুলি পতঙ্গের মত গুঞ্জন করিয়া ফিরে এবং সেই অনলের আকর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

সাহিত্যের ইতিহাসের দীর্ঘ জীবনের প্রতি বাঁকে এই দৃশ্য দেখি। শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে—আর তাহার চারিদিকে একই সুরে পতঙ্গরা গুঞ্জন করিতেছে—অগ্নিশিখা তাহাদের যে মন্ত্রটুকু শিখাইয়াছে, তাহারই পাঠাভ্যাস চলিতেছে।

গ্যেটে, হুগো, টলষ্টয়,—আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবিলেই এই ব্যাপার বোঝা যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের নূতন ধরণের ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার পর, সেই সময় হইতে আজও পর্য্যন্ত দু'এক স্থান বাদে, তাঁহাকে ব্যর্থ অনুকরণ করা মানেই ঐতিহাসিক উপন্যাস। বিশেষ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিও এই প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই এবং তিনি বা তাঁহারা যে সমস্ত সৃ

করিয়াছেন, প্রতিভার আত্মজ হওয়া সত্ত্বেও তাহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও কাব্যে অনুপ্রাণিত হইয়া একই সঙ্গে বহু প্রতিভাশালী ও শক্তিশালী লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাব-ধারা ও প্রকাশের রূপকের প্রভাব তাঁহাদের মধ্যে এমন ভাবে প্রতিফলিত হয় যে, তাঁহাদের সমস্ত শক্তি সত্ত্বেও, এবং বহুসংখ্যক সু-পুস্তক রচনা হওয়া সত্ত্বেও, সাহিত্যের মূল ভাণ্ডারে বিশেষ কিছুই সঞ্চিত হইতে পারে নাই। তাই মাঝে মাঝে সাহিত্যে এমন একটা রূপ ফুটিয়া উঠে যখন সবই এক রকমের দেখায়—একটা ঝুড়িতে ডিমের মত সবই একাকার। অথচ সাহিত্য রূপময়। সাদার মধ্যে সব রং আছে জানিয়া বিজ্ঞান সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের তাহা গ্রাহ্য করা মোটেই পোষায় না। সাতটা রঙের সাতটা রূপ, ইহাতেই সাহিত্যের প্রাণ;—একটা রঙে সাতটা থাকিলেও, তাহাতে তাহার চলে না। সুতরাং একটা রূপের রাজত্ব যখন চলে, তখন সাহিত্য একদিক দিয়া যেমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠে তেমনি আর একদিক দিয়া তাহার ভাণ্ডারে আর নূতন কিছুই জমা হয় না। এই সমস্যার কি কোনও সমাধান নাই? বড়

গাছের আওতায় গুল্ম বাড়িতে পারে না বলিয়া কি, বড় প্রতিভার আওতায় আর সমস্তই গুল্ম-প্রতিভা হইয়া থাকিবে? তৃণ যে ভাবে এই নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক নিয়ম মানিয়া লইতে বাধ্য হয়, সেই নিয়মেই কি মানুষ মস্তিষ্কের উপসর্গের অধিকারী হইয়াও প্রতিভার এই অপগতি মানিয়া লইবে?

হয়ত অনেক সাহিত্যিককেই জীবনে এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অধিকাংশই ইহার কোনও সমাধান করিতে সমর্থ হন নাই—দুই একজন পারিয়াছেন। গোস্তাব ফ্লবেয়ারকে এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল—ভীষণভাবে। কারণ তাঁহার সম্মুখে ছিলেন—ভিক্টর হুগো! হুগোর সর্ব্বগ্রাসী প্রতিভা যে সেই সময় ফরাসী সাহিত্যকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, তাহা ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস-অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন। যে যাহা লিখিতে যায়, তাহাতেই হুগোর ছাপ আসে। হু গো যে সমস্ত অতি-মানব সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার অনুকরণ করিতে বাধ্য হওয়ায় অপ-মানব সৃষ্টি হইতে লাগিল। যে ভাষা, যে ভঙ্গী, যে ভাবনা অতি-মানবের মুখে তাহা হাস্যকর হইয়া উঠে। আর অতি-মানব যত সহজে অপ-মানব হইয়া উঠে,

অপ-মানব তত সহজে অতি-মানব হইতে পারে না। তাই হুগোর "আইডিয়ালিসম্"-এর প্রভাবে বিকৃত রোমান্টিসিসম্ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল।

গোস্তাব যখন দেখিলেন, যাহা-কিছু লিখিতে যাইতেছেন, তাহাই হুগোর অনুকরণ হইয়া যাইতেছে—তখন তিনি মস্তিষ্ককে হাতে লইয়া প্রাণপণে আত্ম-রক্ষার জন্য ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে; প্রথমে তাহা না হইলে আত্মরক্ষার কোনও উপায় নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে যাঁহারা প্রতিভাশালী তাঁহারাই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন। তবে কোনও ক্ষেত্রে এই শক্তি স্বাভাবিক ভাবে থাকে, কোনও ক্ষেত্রে তাহা প্রজ্ঞার দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়।

ফ্লবেয়ার দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া এই শক্তির অধিকারী হন। হুগোর সমস্ত প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া তিনি বস্তুতান্ত্রিকতার নূতন রূপ লইয়া আসিলেন। ছয় বৎসর ধরিয়া তিনি 'ম্যাদাম বোভারী' লিখেন। প্রত্যেকটী কথা ব্যবহার করিতে তাঁহাকে বহু চিন্তা করিতে হইয়াছে এবং এই বিশেষ সতর্কতার ফলে ফ্লবেয়ার ফরাসী সাহিত্যের সব চেয়ে বড় 'ষ্টাইলিষ্ট' বলিয়া পরিগণিত।

ফ্লবেয়ার যখন 'ম্যাদাম বোভারী' প্রকাশ করেন (১৮৫৬), বাস্তবতার রূঢ় চিত্রকে সহসা চোখের সামনে দেখিয়া কেহ কেহ মারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উঠিলেন,—অশ্লীল! ধর্ম্মরাজের মন্দিরেই সর্ব্বপ্রথম টনক নড়িল। অশ্লীলতার অভিযোগে ফ্লবেয়ারকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইল। বহু হাঙ্গামা ও কর্ম্মভোগের পর ফ্লবেয়ার আদালতের হাত হইতে অব্যাহতি পান। নিম্নে ম্যাদাম বোভারীর মূল উপন্যাসের শুধু মর্ম্ম-কথাটী বলা হইল,—

ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত নরম্যাণ্ডী প্রদেশের তোস্তে গ্রামে কোনও ডাক্তার ছিল না। চার্লস্ বোভারী ডাক্তারী শিখিয়া তাই গ্রামেই 'প্রাক্‌টীস্' করিতে লাগিলেন। প্রায়ই আশ-পাশের গ্রাম হইতে 'কল' আসিত এবং বুড়ো ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে গ্রামান্তরেও যাইতে হইত।

একদিন ভোরবেলা—তখনও সূর্য্য উঠে নাই, ডাক্তারের বাড়ীর কড়া ঘন ঘন নড়িয়া উঠিল। চার্লস্ নামিয়া আসিয়া শুনিলেন—আঠারো মাইল দূরে এক গ্রামে এক কৃষকের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে;—তাঁহাকে এখনই সেখানে যাইতে হইবে। যাইতে হইল।

গ্রামে গিয়া দেখিলেন, আঘাত সামান্যই। কৃষকটীর নাম রওয়াল। অবস্থা মন্দ নয়—বয়স হইয়াছে। প্রথম স্ত্রী পরলোকগমন করার পর তিনি দ্বিতীয়বার আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। অবিবাহিতা কন্যা এম্‌মাই সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্রী।

সুতরাং ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার সময় চার্লস্‌এর একমাত্র সহায়কারী হইল এম্‌মা। ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে বাঁধিতে চার্লস্‌ লক্ষ্য করিলেন যে এম্‌মার আঙুলের নখগুলি অপূর্ব্ব শুভ্র; চোখ তুলিয়া দেখিলেন, একজোড়া ঘন ভ্রূর মধ্যে ভ্রমরকৃষ্ণ দুটী চোখ, কিন্তু তাহাতে যেন কোনও মমতা নাই। বিবর্ণ মুখ, কিন্তু মাঝে মাঝে তাহা রক্তিম হইয়াও উঠে। ওষ্ঠের উপরে কোমল ঈষৎ রোম-রেখা সর্ব্বদাই শ্রম-বারি-সিক্ত।

যাইবার সময় রওয়ালকে ডাকিয়া চার্লস্‌ বলিয়া গেলেন, 'কেমন থাকেন দেখবার জন্যে আবার তিন দিন পরে একবার আসবো।'

কিন্তু আসিলেন ঠিক পরের দিনই, এবং তাহার পর হইতে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দুইবার করিয়া যাওয়া-আসা করিতে লাগিলেন!

রওয়াল ডাক্তারের এতখানি সহানুভূতি দেখিয়া

আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল এবং সারাগ্রামে ঘোষণা করিয়া জানাইল যে, এ রকম ডাক্তার এ-অঞ্চলে আর কখনও দেখা যায় নাই।

এই সময় এক সাংসারিক দুর্ঘটনা চার্লসের শান্ত জীবনকে একটু চঞ্চল ও ব্যথিত করিয়া তুলিল। তাঁহার স্ত্রীটী সহসা পরলোকগমন করিলেন। ব্যাপার যদি তাহাতে মিটিয়া যাইত, তাহা হইলে বিশেষ কোনও দুঃখের কারণ হয়ত নাও থাকিতে পারিত। বধূর দিক দিয়া সম্পত্তি পাইবার আশাতেই চার্লসের মা এই বিবাহ দিয়াছিলেন। সহসা বধূটি মরিয়া গিয়া প্রতারণা করিয়া যাওয়াতে চার্লসের মা'র মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে উকীলের হাতে সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার ছিল, তিনি সুবিধা ও সুযোগ বুঝিয়া বৃত্তিগত প্রতিভার পরিচয় দিতে কোনও কুণ্ঠা প্রকাশ করিলেন না।

চার্লস্ যে দুঃখিত হয় নাই তাহা নয়। তবে সাধারণতঃ সুখ-দুঃখের বোধ তাহার তত তীব্র ছিল না। আপনার বিপুল দেহ ও সহজ জীবনের অনাড়ম্বরতার মধ্যে তাহার দিন একরকম বেশই চলিয়া যাইতেছিল। বিপুল কোনও আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল না, বৃহৎ কোন

সম্ভাবনার মোহও তাহার নিশীথ-নিদ্রাকে কণ্টকিত করিয়া তুলিত না ;—তবে স্ত্রীর সম্পত্তির প্রতি তাহারও লোভ ছিল না, তাহা নয়। এই ক্ষুদ্র গ্রামে ডাক্তারী করিয়া এমন কি-ই বা সঞ্চয় করা যায়।

স্ত্রীর মৃত্যু এবং সম্পত্তি-প্রাপ্তির আশার এইরূপ অপমৃত্যুতে চার্লস্ যখন মুহ্যমান্ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সহসা একদিন দেখে রওয়াল কৃতজ্ঞতার পুরস্কার-স্বরূপ কিছু অর্থ এবং একটী বেশ ভাল মোরগ উপহার পাঠাইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তাহার দর্শন-ভিক্ষা জানাইয়া সংবাদও পাঠাইয়াছে।

চার্লস্ যতটুকু ডাক্তারী-শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিল, ততটুকুও যদি মনস্তত্ত্ব-জ্ঞান তাহার থাকিত, তাহা হইলে হয়ত রওয়ালের আহ্বানের পূর্ব্বেই তাহাকে এই পথে আরও বহুবার যাতায়াত করিতে হইত।

একান্ত দূর গ্রামে থাকিয়া আপনার সঙ্গীহীন যৌবনকে লইয়া এম্মা সংসারের কাজের অবসরে যে সমস্ত নভেল পড়িত, তাহা হইতেই সে তাহার আপনার স্বর্গ-লোক রচনা করিয়া লইয়াছিল। কল্পিত নায়ক-নায়িকাদের প্রেমোন্মাদনায় সে ডুবিয়া যাইত। আপনার যৌবনোদ্বেল দেহের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবিত,

কবে কোন্ অলেখা মহাকাব্যের স্বর্গ হইতে তাহার নায়ক তাহার জন্য আসিবে—জীবন প্রেমের রঙে রাঙিয়া উঠিবে! প্রেমের এ অদ্ভুত শক্তির কথা সে নভেল পড়িয়া বেশ ভাল রকমই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল।

সুতরাং শুভলগ্নে পুনর্ব্বার যখন ডাক্তার তাহাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিল, তখন এম্‌মার কালো চোখের আলো জ্বলিয়া উঠিল। এতদিন পরে তাহার কল্পনার নায়ক মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া তাহাকে ধরা দিল!

ডাক্তারেরও স্ত্রীর প্রয়োজন ছিল—বিশেষতঃ এম্‌মার মত সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে। সুতরাং সর্ব্বক্ষেত্রে যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহা হইল। এম্‌মা ও চার্লসের বিবাহ হইয়া গেল।

নূতন পত্নী ঘরে আনিয়া চার্লসের আনন্দের আর সীমা নাই। সারাদিন সে কাজের মধ্যে পরমানন্দে ডুবিয়া থাকে। আপনার ছোটখাটো কাজের মধ্যে সে যেন এক নূতন প্রেরণা পাইল।' এম্‌মার বস্ত্রাঞ্চলের সীমানার মধ্যে চার্লসের সমস্ত জগৎ বাঁধা পড়িয়া গেল।

কিন্তু এম্‌মার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রেমে-পড়ার যে সমস্ত তীব্র অনুরাগের কাহিনী সে বইয়ে পড়িয়াছিল, তাহার কিছুই তাহার বোধ হইল না। যে চিন্তা তাহার

কিশোর-চিত্তকে স্বপন-গন্ধে আকুল করিয়া রাখিয়াছিল, বিস্ময়ে এম্‌মা দেখিল, কর্পূরের মত তাহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে এ কি হইল? এত প্রেম, এত আশা, এত মাদকতা, জীবনে কি এখানেই তাহার পরিসমাপ্তি? বইয়ে কি মিথ্যা কথা লিখিয়াছে? সে কিছুতেই হইতে পারে না, তাহারই ভুল হইয়াছে—চার্লসকে বিবাহ করা তাহার ভুল হইয়াছে।

সে যতই চার্লসকে ভাল করিয়া দেখে, ততই তাহার মনে হয়, যে-নায়কের আবির্ভাবের জন্য সে যৌবনকে পুষ্পিত করিয়া রাখিয়াছে, সে-নায়ক তো চার্লস্ নয়। চার্লস্ কথা বলে নিতান্ত গদ্য-সংসারের ছোটখাটো কথা। সাঁতারও কাটে না, বর্শাও ছোঁড়ে না; কোথায় বৃহত্তর জগৎ বিপুলতর জীবন লইয়া পড়িয়া আছে, তাহার কোনও খবর রাখে না। এই গ্রামটুকু, এই গেরস্থালী, এই প্রতি দিনের খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, এইটুকুর মধ্যেই তাহার মন পরিতৃপ্ত; এবং এম্‌মার আরও রাগ হয় যখন ভাবে যে, এই সামান্য লইয়া সেও সন্তুষ্ট হইয়া আছে, ইহাই চার্লসের বিশ্বাস।

তাহার উপর শাশুড়ী! তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ঝগড়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিরক্ত

হইয়া আপনার মনে এম্‌মা ভাবে,—কেন বিয়ে করলাম ?

নভেলে প্রতি-পাতায় যেমন করিয়া রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে, জীবনে ক্বচিৎ তাহা সম্ভব হয়। মাঝে মাঝে কোথাও তরঙ্গ ওঠে, মাথার ওপরে বজ্র আঁধার-মেঘে গর্জ্জন করে ; তাহা ব্যতীত জীবন-নদী অনাদিকাল হইতে অব্যতিক্রম ছন্দে একান্ত নিঃশব্দেই প্রতিদিনের অতি সাধারণ প্রয়োজনের বোঝা বহিয়া চলিয়াছে।

নিতান্ত একঘেয়ে জীবনের মধ্যে এম্‌মার নিকট সহসা একটা অভিনবত্বের সম্ভাবনা দেখা দিল। সেই প্রদেশের জমিদার ফ্রান্সের শাসন-পরিষদের সদস্য হইবার জন্য নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইলেন। সহসা প্রজা ও প্রতিবেশীদের উপর তাহার সু-নজর বৃদ্ধি পাইল, কারণ ভোটের প্রয়োজন। বিশিষ্ট প্রতিবেশীদের লইয়া তিনি একটী বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন এবং যেখানে প্রয়োজন মনে করিলেন সেখানে স্বয়ং গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। বোভারীদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া তিনি ডাক্তারের চেরীবাগান এবং সেই সঙ্গে তাঁহার সুন্দরী স্ত্রীর রূপের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া গেলেন। রূপের প্রশংসায় কোন্ নারী না সন্তুষ্ট হয় ? এম্‌মা যে-

দিন থেকে নিমন্ত্রণের কথা শুনিল, সেইদিন হইতে তাহার আর আনন্দের সীমা নাই! আপনার মনে সে ভাবে—আলো, উৎসব, নৃত্য, আনন্দ, সঙ্গীতের কথা।

নিমন্ত্রণের দিন। চার্লাস্ ট্রাউসার পরিতে-পরিতে বলিল, এটা বড্ড টাইট হয়ে গেছে—নাচবার সময় বড়ই অসুবিধে হবে।

এম্‌মা হাসিয়া বলিল, কি সর্ব্বনাশ, তুমি নাচবে না কি? তোমার মত ডাক্তারের না নাচাই উচিত; লোকে হাসবে যে?

চার্লস্ একটু অপ্রতিভ হইয়া হাসিল মাত্র।

এম্‌মা সারা দুপুর ধরিয়া আপনার সাজগোছ লইয়া ব্যস্ত ছিল। অপরাহ্ণে যখন প্রসাধন ও সজ্জা শেষ করিয়া বাহির হইল, তখন তাহার সৌন্দর্য্যের নব-সংস্করণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া চার্লস্ পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া তাহার স্কন্ধে চুম্বন করিল।

বিরক্ত হইয়া এম্‌মা বলিয়া উঠিল, "আঃ, কর কি, সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে!"

নৃত্য-সভায় এম্‌মা একজন বলিষ্ঠ দেহ যুবকের সঙ্গে নৃত্য করিল। যুবকের কেশের সুরভি তাহার ভাল

লাগিতেছিল, চারিদিকে আলো তাহার মনকে উন্মাদ করিয়া তুলিতেছিল। বহুক্ষণ ধরিয়া তাহারা নৃত্য করিল।

রাত্রি-শেষে ভোরবেলা স্বামী-স্ত্রীতে তাহারা আবার বাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছে। গতরাত্রির উৎসবের দীপ নিবিয়া গিয়াছে। পথে চলিতে চলিতে সহসা রাস্তায় একটা চকচকে জিনিষের উপর এম্‌মার নজর পড়িল। চার্লস্ গাড়ী হইতে নামিয়া দেখে, একটা চমৎকার সিগার-কেস। কাহারও পকেট হইতে হয়ত পড়িয়া গিয়াছে। সিগার-কেসটী দামী এবং তাহার ভিতর তখনও দুটী সিগার ছিল। গন্ধেতে মনে হয় যে, সিগারগুলোও দামী। কেসটী পকেটে রাখিয়া চার্লস্ বলিল, ভালই হ'ল, আজ সন্ধ্যেয় খাওয়া যাবে!

ব্যঙ্গ করিয়া এম্‌মা বলিল, তুমি আবার সিগার খাও না কি?

সুবিধে পেলে কখনও কখনও খাই বই কি?

সন্ধ্যাবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর একটা সিগার ধরাইয়া খাইতে আরম্ভ করায় চার্লস্ ভয়ানক কাশিতে লাগিল। কোনও মতে ধোঁয়া আর সে লইতে পারে না।

চার্লসের অবস্থা দেখিয়া এম্‌মা বলিল, যা সহ্য হয়

না, তা খাবার দরকার কি ? কুড়িয়ে পেয়েছ বলেই কি খেতে হবে ?

রাগে এম্‌মা সিগার-কেসটী লইয়া ঘরে একটা আয়নার পিছনে ফেলিয়া রাখিল।

রাত্রিবেলা যখন সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন এম্‌মা নিঃশব্দে উঠিয়া আয়নার পাশ হইতে সিগার-কেসটী বাহির করিল। কেসটী খুলিতেই ভার্বিনা আর তামাকের গন্ধ নাকে গিয়া লাগিল ; তাহাই সে ফুলের গন্ধের মত নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিল। সেই গন্ধ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল, তাহার নভেলে পড়া জীবনের কথা, যেখানে আনন্দ আর অপর্য্যাপ্তের মধ্যে মানুষ কি আনন্দেই না থাকে। এম্‌মা আপনার সাধ্যমত তাহার আশপাশের জগৎটীকে তাহার মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিল। তাহাতে চার্লসের খরচ একটু বেশী হইতে লাগিল বটে, কিন্তু রাত্রিবেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া যখন সে বাড়ী ফিরিত, তখন ঘরের পারিপাট্য, সাজসজ্জায় একটু বিলাসিতার আভাস তাহার ভালই লাগিত। সকলের উপর তাহার ভাবিতে ভাল লাগিত যে, এম্‌মা তাহারই জন্য এই সব আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে,—হইলই বা সামান্য খরচ ! এম্‌মাকে

সে যতই দেখিত, ততই তাহার নূতন লাগিত, ভাল লাগিত। এম্‌মা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিত, চার্লসের হৃদয় গলিয়া যাইত।

এম্‌মা কিন্তু তাহার আপনার মনকে ভুলাইতে নূতন নূতন আস্‌বাবপত্র কিনিত; তাহার অন্তরের বাসনাকেই যথাসম্ভব পরিতৃপ্ত করিতে। প্রতিরাত্রে যখন সে কর্ম্ম-শ্রান্ত চার্লসকে অভ্যর্থনা করিত, তখনই তাহার মনে কে যেন বলিয়া উঠিত, এই বোকা লোকটীর সেবার জন্যই কি এতদিন তুমি বসেছিলে? সে আপনার মনে হাসিয়া উঠিত; সেই হাসিতে চার্লসের অন্তর ভরিয়া যাইত। জীবনে সমস্ত জিনিষই ডাক্তারের কাছে সহজ লাগিত;—কোনও বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা তাহার মনকে সহজ-আনন্দের বাহিরে কোনও রস-আস্বাদনের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আনিয়া দেয় নাই; যেটুকু জগৎ লইয়া সে আসিয়াছিল, সেইটুকুর মধ্যে তাহার দিন পরমানন্দে চলিয়া যাইতেছিল।

চার্লসের এই আত্ম-তৃপ্তি দেখিয়া এম্‌মার রাগ হইত। তাহার অন্তরের নিরুদ্ধবাসনা ও ক্রোধ আত্ম-প্রকাশের জন্য একটা হেতু খুঁজিত; কিন্তু চার্লসের এই 'অহেতুক' আত্ম-তৃপ্তি তাহার আত্ম-প্রকাশের শেষ

সুবিধাটুকুও বিনষ্ট করিয়া দিত। গতি যাহার নিরুদ্ধ, বাধার পাষাণ-গাত্রে আস্ফালন করাই তার একমাত্র শান্তি। সে শান্তিটুকুই এম্‌মা ভোগ করিতে পারিত না এবং তাহারও জন্য দায়ী করিত ঐ নির্ব্বোধ স্বামীটিকে।

একদিন পুরাণো কাপড় গোছাইবার সময় হঠাৎ একটা কিসে লাগিয়া তাহার আঙুল কাটিয়া গেল। খুঁজিয়া দেখে, তাহার বিবাহের মুকুট। কাগজের ফুল-আটকানো তারে তাহার আঙুল কাটিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর তখন আগুন জ্বলিতেছিল। কি মনে করিয়া এম্‌মা মুকুটটা সেই আগুনে ফেলিয়া দিল। কাপড় আর কাগজ শীঘ্রই জ্বলিয়া উঠিল। এম্‌মা একমনে দেখিতে লাগিল কাপড়ের ফুলগুলি কেমন পুড়িয়া মরিতেছে।

এমনি করিয়া চার্লসের আত্মতৃপ্ত সহজ জীবনের পাশে এম্‌মা আপনার অন্তরের সমস্ত নিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা লইয়া দিনযাপন করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাহার উপর সন্তান-সম্ভবা হওয়ায় এম্‌মার শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। চার্লস ব্যস্ত হইয়া উঠিল। পত্নীর স্বাস্থ্যের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তন সে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিল এবং কাল-বিলম্ব না করিয়া তাহার ব্যবস্থাও করিল।

তোস্তে গ্রামের পসার-প্রতিপত্তি পিছনে ফেলিয়া ডাক্তার আর এক নূতন গ্রাম ঠিক করিল। এম্‌মার বায়ু-পরিবর্ত্তন এবং তাহার নূতন প্রাক্‌টিস সেইখানেই চলিবে।

রুয়ে থেকে কুড়ি মাইল দূরে এক গ্রামে বোভারী-দম্পতী উঠিয়া আসিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের গ্রামের হোটেলে প্রথম পদার্পণ করিতে হইল। কারণ তাঁহাদের আগমন উপলক্ষ্যে উক্ত গ্রামের ভদ্রমহোদয়গণ হোটেলে এক ভোজের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এতদিনের এক-জন অভিজ্ঞ ডাক্তার গ্রামের অতিথি হইবেন, গ্রামবাসীর পক্ষে উহা কম সৌভাগ্যের কথা নয়! তাহার উপর, ডাক্তারকে সন্তুষ্ট রাখিতে সবাই চায়।

এই সম্মানটুকু এম্‌মার বড় ভাল লাগিল। বিশেষ করিয়া হোটেলে ভোজের সময় মঁসিয়ে লিওঁর সহিত আলাপ ও কথাবার্ত্তা এবং তাহার সুগঠিত যৌবনদীপ্ত মুখখানি এম্‌মার অন্তর স্পর্শ করিল। পরস্পরের মধ্যে যে সমস্ত কথার আদান-প্রদান হইল, তাহাতে দুইজনই বুঝিল যে পরস্পরের ভাব, ভাবনা ও রুচির বেশ একটা মিল আছে। এম্‌মা যখন এই নূতন বন্ধুর সহিত আলাপে

ব্যস্ত ছিল, তখন চার্লস্ সেইখানকার একজন ওষুধ-বিক্রেতার সঙ্গে আলাপ করিতেছিল। তাহারাও উভয়ে সানন্দে আবিষ্কার করিতেছিল যে, তাহাদেরও দুইজনার মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে।

এম্মা আশা করিয়াছিল, তাহার একটী পুত্র-সন্তান হইবে। কিন্তু হইল একটী মেয়ে। মেয়ের নামকরণ লইয়া এম্মা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। চার্লসের দেওয়া কোন নামই তাহার পছন্দ হয় না। তোস্তে গ্রামের জমিদারের ভোজসভায় এম্মার মনে পড়িল যে, জমিদার-গৃহিণী কোন্ একটী সুন্দরী মেয়েকে বার্থা বলিয়া ডাকিয়াছিল। সেই নামই তাহার ভাল লাগিল এবং মেয়ের নাম বার্থা রাখা হইল।

শিশু-কন্যাকে লালন-পালন করিবার জন্য, সেই গ্রামের রুলে-পরিবারের গৃহিণী স্বয়ং ভার লইলেন এবং কন্যাকে সেইখানেই রাখা হইল। বোভারী-দম্পতী প্রত্যহ তাহাদের বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসিতেন।

গ্রামের শেষে রুলেদের বাড়ী। এম্মাকে অনেকখানি হাঁটিয়া যাইতে হইত। সেইজন্য চার্লস্ প্রায়ই এম্মার সঙ্গে যাইত। একদিন কার্য্যগতিকে এম্মাকে একলা যাইতে হইল। পথে লিওঁর সঙ্গে দেখা।

এম্‌মার শরীর তখনও ভাল করিয়া সারে নাই। তখনও তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা বাহির হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়।

কুশলপ্রশ্নের পর লিওঁ এম্‌মার সহায়তার জন্য নিজের হাত বাড়াইয়া দিল। এম্‌মা দ্বিরুক্তি না করিয়া হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল। লিওঁর স্বর্ণাভ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ এম্‌মার কেশের সহিত বাতাসে মিশিয়া যাইতেছিল। লিওঁর হাতের আঙুলের দিকে চাহিতে এম্‌মার নজরে পড়িল নখগুলি কি পরিষ্কার স্বচ্ছ!

এমনি প্রায়ই তাহাদের দেখা হয়। ক্রমশঃ প্রতিদিনের দেখা-শোনা কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া দুজনার বন্ধুত্ব বেশ সহজ হইয়া আসে। লিওঁ আপনার মনে অনুসন্ধান করিয়া দেখে, সে এম্‌মাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে তাহার ভয় ও সঙ্কোচ হয়। এম্‌মাও আপনার মনে বিচার করিয়া দেখে কোথায় কি একটা পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে, কিন্তু প্রেম করিয়া একবার ভুল করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে সন্দেহ হয়, সত্যই সে প্রেমে পড়িয়াছে কি না। সে পড়িয়াছিল। প্রেম আসে বন্যার

মত, একটা তুমুল তরঙ্গের মত, একটা অসম্ভব চাঞ্চল্য ও উন্মাদনা; এক্ষেত্রে সেরূপ কোন লক্ষণ ভিতরে বা বাহিরে প্রকট না হওয়ায়, এবং অপর পক্ষের শান্তভাব দেখিয়া এম্‌মাও মনে প্রতিহত বাসনার বিক্ষোভ ভোগ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ এই বিক্ষোভ এম্‌মার প্রতি কার্য্যে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সকল কার্য্যে তাহার বিরক্তি। এক-দিন রাগের উপর সে বার্থাকে ছুঁড়িয়াই ফেলিয়া দিল। বার্থার অপরাধ, সে নাকি তাহার বাপের মতই কুৎসিত হইয়াছে।

লিওঁ ও-ধারে আপনার নিরুদ্ধ প্রেমের যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছিল। আশঙ্কা ও আসক্তির মধ্যে অস্থির হইয়া সে স্থির করিল, এইখানেই এই ব্যাপারের যাহা হয়, একটা নিষ্পত্তি করিবে। সে প্যারীতে চলিয়া যাইবে স্থির করিল।

যাইবার দিন বিদায়-সম্ভাষণ উপলক্ষ্যে এম্‌মার কর-মর্দ্দন করিতে গিয়া সেই কোমল উষ্ণ করপুটের স্পর্শে লিওঁর সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। মনে হইল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেইটুকু করপুটের মধ্যে যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। এম্‌মা বড় বড় চোখ দুইটী তুলিয়া

একবার লিওঁর দিকে চাহিল। চোখ নামাইয়া আবার চাহিতে গিয়া দেখে, লিওঁ চলিয়া গিয়াছে।

ঠিক এই রকমটী যে হইবে, তাহা এম্‌মা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। লিওঁ চলিয়া যাইবার পর তাহার মনের অশান্তি যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। সন্ধ্যাবেলায় দুজনে সেই গ্রামের পথে একটুখানি বেড়ানো, নানা বিষয়ে সেই সব ছোট-খাটো কথা, সেই সকল কাজের শেষে প্রতিদিন দেখা বৈচিত্র্যহীন জীবনে সেই একটুখানি নূতনত্বের আভাস, আজ এত বড় হইয়া সে দেখা দিবে তাহা এম্‌মা ভাবে নাই।

সে আপনাকে শত তিরস্কার করিতে লাগিল—তাহারই জন্য তো লিওঁ এইরূপভাবে প্যারী চলিয়া গেল। যে প্রদীপ আর একটু বাতাসেই জ্বলিয়া উঠিত, সে কেন তাহাকে ফুৎকারে নিবাইয়া দিল ?

লিওঁর চলিয়া যাইবার পর চার্লসকে দেখিলে এম্‌মার অন্তরের বিক্ষোভ যেন আরও বাড়িয়া উঠিত। মনের দুঃখ মিটাইবার জন্য এম্‌মা বহুকালের এক সনাতন প্রথার আশ্রয় গ্রহণ করিল। স্থানীয় পোষাক ও গহনা-বিক্রেতার দোকান হইতে কিছু কিছু নূতন পোষাক ও গহনা কিনিতে আরম্ভ করিল। বিক্রেতা লোকটীও

ছিল ভালো। সে নগদ মূল্যের জন্য কোন দাবী করিত না। বিল সব ডাক্তার মহাশয়ের জন্য জমা হইত। পুরাণো খবরের কাগজ দেখিয়া এম্‌মা প্যারীর হাল-ফ্যাসানের পোষাক তৈয়ারী করিল, চুল সেই রকম ভাবে কাটিল। প্যারীর ভবিষ্যৎ অধিবাসিনীর মত সে সাধ্যমত নিজেকে গড়িয়া তুলিতে লাগিল। মাঝে খেয়াল হইল যে, সে নব্য নারীদের মত ইতালীয়ান্ ভাষা শিখিবে। কালবিলম্ব না করিয়া সে চার্লসকে দিয়া একটী ইতালী ভাষার অভিধান এবং প্রাথমিক ব্যাকরণ কিনাইল। স্ত্রীর শিক্ষা-গৌরবে চার্লস উল্লসিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু, যতই দিন যায় এম্‌মার শরীর ততই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে মূর্চ্ছাও হয়। বিব্রত হইয়া চার্লস তাহার মাকে আনাইলেন। শাশুড়ী আসিয়া বউয়ের গতিবিধি ও ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া পুত্রকে ডাকিয়া বলিল—"ও-সব বুঝি না যাপু—বউকে যদি খেটে খেতে হতো তাহলে এ সব ব্যায়রাম আর হতো না।" কথা বউয়ের কানে গিয়া উঠিল এবং স্বাভাবিক নিয়মে শাশুড়ীকে আবার স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে হইল। আপনার মানসিক ও দৈহিক ব্যাধি লইয়া এম্‌মা

আপনার কল্পনায় প্যারীর দিকে ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগিল।

সহসা একটী ঘটনা ঘটিল। সামান্য ঘটনা। পাশের গ্রামের জমিদার রুডলফ্ চিকিৎসার জন্য চার্লসের শরণাপন্ন হইল।

অসুখ একটু বেয়াড়া রকমের। শরীর হইতে কিছু রক্ত বাহির করিয়া দিতে হইবে; রক্তাধিক্য বশতঃ তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করেন যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন পিঁপড়ে কামড়াইতেছে। চার্লস্ অপারেশন করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু 'অপারেশন' কৃতকার্য্য না হওয়ায় রুডল্ফ্ অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং শুশ্রূষার জন্য চার্লস্ এম্মার সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এম্মার শুশ্রূষায় রুডল্ফ্ অল্পকালের মধ্যে জ্ঞান ফিরাইয়া পাইলেন এবং চোখ চাহিতেই বিস্ময়ে দেখেন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক অপরূপ সুন্দরী। রুডল্ফ্ ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। মেয়েটীর মুখের দিকে আর একবার গভীর-ভাবে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। নারী-তত্ত্ব সম্বন্ধে রুডলফের যতটুকু জ্ঞান ছিল, তাহাতে সেই আবহাওয়ার মধ্যে এই শুশ্রূষাকারিণীকে দেখিয়া তাঁহার যেন কোথায় কি বিসদৃশ লাগিতেছিল। এই

সুদূর গ্রামে প্যারীর উদ্যানের ফুল কেমন করিয়া ফুটিল? পরিচয়ে যখন জানিলেন যে, এই নারী ডাক্তারেরই স্ত্রী, তখন রুডল্‌ফ্‌ অন্যান্য বহু পুরুষের মত এম্‌মাকে অন্তরে দয়া করিতে লাগিলেন। এই মোটা কদর্য্য ব্যক্তি তিন দিন ধরিয়া যে দাড়ি কামায় নাই, হাতের নোখগুলোও কাটে না, জামায় এক মাসের ঘামের গন্ধ;—আর এই নারী—সুন্দরী, রূপকলাময়ী! তার চোখের চঞ্চল দৃষ্টি রুডলফ কে যেন স্পষ্টই বলিয়া দিতেছিল যে, সে বন্দিনী, মুক্তি চায়!

সুস্থ হইয়া সে-দিন চলিয়া আসিবার পর এম্‌মার সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য রুডলফ্‌ একটা কৃষি-প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিল। অন্যান্য লোকদের সহিত যথারীতি ডাক্তার-দম্পতীদেরও আমন্ত্রণ করা হইল।

সভার পুরস্কার-বিতরণ কার্য্য যখন হইতেছিল তখন রুডল্‌ফ্‌ এম্‌মাকে লইয়া প্রদর্শনীর নানাবিধ জিনিষ দেখাইতেছিল এবং তাহারই অন্তরালে আপনার প্রেম-নিবেদনের শুভ-অবসরটুকু খুঁজিতেছিল। অন্যমনস্কভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে, তাহারা উভয়ে দেখে যে, তাহারা সভা হইতে দূরে একান্ত নির্জনতার মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে। কেহই তাহাতে বিস্মিত হইল না। তাহাদের দুইজনের

অন্তরের সম্মিলিত কামনাই যেন এই নির্জনতাকে রচনা করিয়াছে।

রুডল্‌ফ্‌ এম্‌মার হাত চাপিয়া ধরিল। এম্‌মা তাহাতে বাধা দিল না। এম্‌মার দুইটী হাত যুক্তভাবে বুকে তুলিয়া ধরিয়া রুডল্‌ফ্‌ বলিল, "নির্জনতা এত সুন্দর আর কখনও হয় নি—তুমি, শুধু তুমি—"

ঈষৎ আনত-আননে এম্‌মা কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"তোমার পক্ষে তা হয়ত সত্য, কিন্তু কিছুদিন পরে তোমার মনেও থাকবে না যে আমার ছায়া তোমার জীবনে এসে পড়েছিল—এও তো সত্য ?"

"না, না কখনই নয়! আমার জীবনের প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তুমি সজীব হয়ে থাকবে—"

সেদিনকার এই ঘটনার পর ছয় সপ্তাহ আর তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। কার্য্যগতিকে রুডল্‌ফ্‌কে অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়াই সে এম্‌মাদের বাড়ীতে তাহার সহিত দেখা করিতে চলিল। দেখে, এম্‌মা এই ছয় সপ্তাহেই বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে—

তাহারই অদর্শনের বেদনা যেন তাহাকে কৃশ করিয়া দিয়াছে। নিরুদ্ধ কামনার ধূমে তাহার আনন মলিনতর হইয়া গিয়াছে—কিন্তু নয়নে তাহার অনির্ব্বাণ বহ্নির উত্তাপজ্বালা যেন শত-শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

চার্লস্ স্ত্রীর এই স্বাস্থ্যহানিতে সত্যই উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। তাই রুডলফের নিকট ডাক্তার কিরূপে পত্নীর নষ্ট-স্বাস্থ্য উদ্ধার করা যায়, তাহার পরামর্শ চাহিল। রুডলফ্ একটু ভাবিয়া বলিল, "আমার মনে হয় উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবেই এই স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। নিয়মিত অশ্বারোহণ করলে, আমার মনে হয়, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট-স্বাস্থ্য ফিরে আসবে—"

একটু বিব্রত হইয়া চার্লস বলিল—"কিন্তু আমাদের তো ঘোড়া নেই—"

"তাতে কি হয়েছে—আমি কিছুদিনের জন্যে একটা ঘোড়া ব্যবহার করিতে দিতে পারি—"

এম্মা কিন্তু তাহাতে ঘোরতর আপত্তি জানাইল। সুতরাং সেদিনকার মত আলোচনা সেইখানেই থামিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা স্বামী-স্ত্রীতে যখন তাহারা একত্রা হইল, চার্লস্ ক্ষুব্ধ স্বরে এম্মাকে বলিল, "রুড়লফের

ইচ্ছায় এ-রকম বাধা দেওয়া তোমার ঠিক হয় নি এম্‌মা!”

“বাঃ! ঘোড়ায় চড়বো কি এই বেশে? এর জন্যে তো একটা আলাদা পোষাক চাই!”

“তা বেশ! আর একটা পোষাক তৈরী করে নেবে।”

যথাসময়ে পোষাক তৈরী হইয়া আসিল। চার্লস্ বিল সই করিল। দরজী লোকটী ছিল ভাল—টাকার জন্য তত তাগাদা করিত না, কারণ সে জানিত যত বিলম্ব হইতেছে সুদও তত বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু ইদানীং বিল একটু বেশী হইয়া যাওয়ার জন্য সে তাগাদার সুর একটু বদলাইয়াছে।

চার্লস্ স্বয়ং রুডল্‌ফ্‌কে লিখিয়া জানাইল যে, তাহার স্ত্রীর মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তিনি ইচ্ছা করিলে ঘোড়া পাঠাইয়া দিতে পারেন।

পরের দিনই সকালে রুডলফ্ স্বয়ং ঘোড়ায় চড়িয়া এবং সঙ্গে আর একটী ঘোড়া লইয়া উপস্থিত। এম্‌মা নূতন পোষাক পরিয়া সানন্দে ঘোড়ায় চড়িল। রুডল্‌ফ্ তাহাকে উঠিতে সাহায্য করিল। গ্রামের বন ছাড়িয়া তাহারা দুইজন বনের পথ ধরিল। সদ্যজাত বনকুসুমের গন্ধে এমম্‌ার অন্তরে যেন আজ শত নিষ্পেষিত কুসুম-

কলি সৌরভে জাগিয়া উঠিল। এতদিন পরে যেন তাহার মনে সত্যে ও স্বপ্নে মিশিয়া এক অনাস্বাদিত রসের প্রথম স্পর্শ লাগিল। বনের মধ্যে এক নির্জ্জন স্থানে ঘোড়া হইতে তাহারা দুজনে নামিল। শিশির-ভেজা ঘাসে পা ফেলিতে এম্‌মার মনে হইতেছিল যে, সে যেন এক নূতন পৃথিবীর অঙ্গে আজ এই প্রথম পদার্পণ করিল।

এক শিলাসনে পাশাপাশি বসিতেই এম্‌মার সর্ব্ব-অঙ্গে শিহরণ জাগিয়া উঠিল। রুডল্‌ফ্‌ প্রেম-নিবেদন করিল। এই ভাষা, এই ছন্দের জন্যই অন্তরের সংগোপনে এম্‌মা এতদিন ধরিয়া বসিয়াছিল—সহসা এইরূপ ভাবে তাহারই উদ্দেশ্যে তাহা প্রযুক্ত হইতে শুনিয়া প্রথম ভয়ভীতা বিহঙ্গমের মত তাহার অন্তরে কে যেন একবার কাঁপিয়া উঠিল। অবসন্ন দেহে রুডলফের কাঁধে মাথা রাখিয়া এম্‌মা বলিয়া উঠিল, "চুপ কর, চুপ কর—আর আমি শুনতে চাই না—"

তাহারা যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

পরের দিন বনের মধ্যে এক কাঠুরিয়ার কুঁড়েঘরে

ঘন চুম্বনের অন্তরালে তাহারা শপথ করিল, তাহাদের মিলন অনাদিকালের—মৃত্যুর পরও তাহাদের আত্মা সম্মিলিত ভাবেই থাকিবে।

সেইদিনের পর হইতে প্রতি সন্ধ্যায় তাহারা পত্রালাপ করিতে লাগিল। এম্‌মা স্বামীর সহিত অশ্বারোহণে, কখনও বা একা, গ্রামের ধারে নদীর তীরে একটী নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বালুকার মধ্যে গোপনে চিঠি রাখিয়া আসিত। প্রভাতে রুডল্‌ফ্‌ আসিয়া সেই স্থানে পত্রের উত্তর রাখিয়া যাইতেন। এমনি করিয়া চিঠির খেলার মধ্য দিয়া তাহাদের অতৃপ্ত কামনার পরিতৃপ্তি ঘটিত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দূর গ্রামে এক রোগী দেখিতে চার্ল্‌স্‌ চলিয়া গিয়াছে। সহসা এম্‌মার মনে হইল, সে রুডল্‌ফের বাড়ীতে গিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে পারিত।

অন্ধকারে সে কখন বাহির হইয়াছে—দূর পথে শঙ্কাকম্পিত চিত্তে সে চলিয়াছে—রুডলফের বাড়ীর দরজায় গিয়া কখন দাঁড়াইয়াছে! দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখে সম্মুখের ঘরে মৃদু আলোকে শুভ্র শয্যায় রুডল্‌ফ্‌ একা ঘুমাইতেছে! পথ-শ্রমে অবসন্ন দেহে শঙ্কায় অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

তারপর যখনই চার্লস্ গ্রামান্তর যাইত, এম্মা রুডলফের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইত। যত দিন যায় এম্মার কামনার শিখা দীর্ঘতর হইয়া উঠে—কিন্তু রুডলফের পুরুষচিত্তে নামে ক্লান্ত ছায়া। এম্মা তাহা বোঝে না। এই গ্রাম ছাড়িয়া দূরে বহুদূরে, ইতালীর সূর্য্যকরোদ্ভাসিত চির-আনন্দের নগরীতে পলাইয়া যাইবার জন্য এম্মা নিয়ত রুডল্ফকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু রুডলফের চিত্ত তাহতে সায় দেয় না। অবশেষে এম্মার চুম্বনের ঘন আবেদনে রুডল্ফ্ সম্মত হইল! বিশেষ করিয়া স্বামীর অজ্ঞাতসারে সে যে সমস্ত কর্জ্জ করিয়াছিল, তাহার তাগাদায় এবং জানাজানি হইবার আশঙ্কায় সে ভীত হইয়া উঠিতেছিল। কোনও কোনও স্থলে তাগাদা মিটাইবার জন্য এম্মা ডাক্তারের নামে কর্জ্জও গ্রহণ করিয়াছিল। এতদিন ধরিয়া যে দেনা তিলেতিলে জমা হইতেছিল, তাহা একত্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এম্মা লক্ষ্য করে নাই। তাই দেনার হাত হইতে এড়াইবার জন্য এম্মা আরও অস্থির হইয়া উঠিল।

চার্লসের দিন কিন্তু তেমনি চলিয়াছে। পশু-চিকিৎসা সম্বন্ধে ইদানীং সে নিঃশব্দে গবেষনা করিতেছিল।

কিন্তু গবেষণাকে যখন সে সাক্ষাৎ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গেল, দেখে ফল তাহার বিপরীত হইয়াছে, এতদিন ধরিয়া ডাক্তার হিসাবে যেটুকু সুনাম সে অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু তবুও তাহার আনন্দের কোথাও ব্যাঘাত নাই, তাহার পৃথিবী তেমনি স্থির আছে, যেমন সে প্রথম জন্মিয়া তাহাকে দেখিয়াছিল।

পলায়নের দিন স্থির। এম্‌মা প্রস্তুত। এক ভৃত্যের হাতে রুডল্‌ফ একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছে —"রাগ করো না এম্‌মা···আমি তোমার সারা জীবনকে ভারাক্রান্ত করবার দায়িত্ব নিতে পারবো না······"

চিঠি পড়িয়া এম্‌মার সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল— নিদারুণ এক চীৎকারে অচৈতন্য হইয়া সে পড়িয়া গেল। ছয় সপ্তাহ সে আর শয্যা হইতে উঠিতে পারিল না।

স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি-অবনতির এই বিচিত্র ধারা চার্লস্‌ বুঝিতে পারেন না। আপনার পুরাতন ডাক্তারী

বইগুলি তিনি নাড়া-চাড়া করেন, আর হতাশ হইয়া পড়েন।

এম্‌মা সারিয়া উঠিলে চার্ল্‌স্ চিত্তবিনোদনের জন্য রুয়ে নগরে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। রুয়ে থিয়েটারে সঙ্গীত শুনিবার জন্য তাহারা যাত্রা করিল।

রুয়ে থিয়েটারে অভিনয় দেখিবার অবসরে চার্ল্‌স্ এম্‌মার জন্য কিছু খাবার আনিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া সানন্দে এম্‌মাকে জানাইলেন, লিওঁর সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে।

সহসা লিওঁর নামে এম্‌মা সচকিত হইয়া উঠিল। সে প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিল না। নিরুদ্ধ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

"লিওঁ। লিওঁকে ভুলে গেছ তুমি বুঝি?"

এম্‌মার বুকে কে যেন হাতুড়ির আঘাত করিতে লাগিল। মনে পড়িল—একদিন তাহারই উপর অভিমান করিয়াই তো সে চলিয়া গিয়াছিল!

দুই-এক মিনিটের মধ্যে লিওঁ সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিতান্ত প্রাথমিক আলাপের পর লিওঁ নিজের অবস্থা সম্বন্ধে জানাইল যে, আইন-অধ্যয়ন শেষ করিয়া বিশ্রামের জন্য কিছুদিন সে রুয়েতে আছে।

পরের দিন সকাল-বেলাতেই বোভারী-দম্পতীর স্বগ্রামে ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু চার্লসের অনুরোধে এম্‌মাকে আর একদিন থাকিয়া যাইতে হইল। এম্‌মার অন্তরে কে যেন বলিয়া উঠিল, না থাকিলেই ভাল ছিল।

সন্ধ্যাবেলায় লিওঁ আসিয়া উপস্থিত হইল। জীবনের অভিজ্ঞতার পাত্র হইতে দুজনেই আজ তিক্ত-কষায়-মধুর রসাস্বাদ করিয়াছে। তাই আজ লিওঁর অন্তরে সঙ্কোচের বাধা নাই, কিন্তু এম্‌মার অন্তরে আজ সন্দেহের বিড়ম্বনা। লিওঁ তেমনি প্রেম-নিবেদন করে—এম্‌মা হাসে। বলে, আমি তো আজ বৃদ্ধা! লিওঁ শোনে না। কথা হইল গির্জ্জায় তাহারা দেখা করিবে।

সারারাত্রি ধরিয়া এম্‌মা আপনার মনের সঙ্গে সংগ্রাম করিল এবং অবশেষে স্থির করিল যে সে লিওঁকে নিরস্ত করিবে। যাহাতে তাহারা আর পরস্পর না দেখা সাক্ষাৎ করে, সেই মর্ম্মে এম্‌মা একখানি পত্র লিখিল। কিন্তু পত্র লইয়া যাইবে কে? এম্‌মা মনে মনে ঠিক করিল, গির্জ্জায় গিয়া সে পত্রখানি স্বয়ং লিওঁর হাতে দিয়াই চলিয়া আসিবে।

গির্জ্জায় দেখা হইল। দেখা হইবামাত্রই সে পত্র-

খানি লিওঁকে দিবার জন্য হাত বাড়াইল, কিন্তু পত্র না লইয়া লিওঁ এম্‌মার হাত ধরিল। সম্মুখে একটী গাড়ী ছিল। গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বলিল, "চল!"

"কোথায় যাব?"

"যেখানে তোমার খুশী।" উত্তর দিবার পূর্ব্বেই এম্‌মা দেখে যে লিওঁ কখন তাহাকে হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়াছে এবং সেও উঠিয়াছে। রুয়ের রাজপথ ছাড়াইয়া গাড়ী যখন জন-বিরল প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তখন দেখা গেল যে একটি কোমল মৃণাল হস্ত গাড়ীর পর্দ্দা সরাইয়া একটা শাদা কাগজ কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে। বাতাসে কাগজের কুচিগুলি প্রান্তরের বন-কুসুমের উপর ইতস্ততঃ গিয়া পড়িতেছিল।

স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াই এম্‌মা এক মহাবিপদে পড়িল। এতদিন যে দরজী সুদের লোভে বিল অনবরত পিছাইয়া রাখিয়া চলিয়াছিল, অতঃপর সে জানাইয়াছে সুদে-আসলে টাকা না পাইলে সে আর শুনিবে না—নালিশ করিবে এবং একদিন সত্যই আট হাজার ফ্রাঙ্কের দাবী লইয়া পুলিসের ওয়ারেণ্ট আসিয়া হাজির হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে আসবাব-পত্র সমস্ত নীলাম হইবে! তারপর?

এম্‌মার সমস্ত চেতনা বিলুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। এ কি সর্ব্বনাশ! সহসা লিওঁর কথা মনে পড়িল। এ বিপদে সে কি সহায়তা করিবে না?

এম্‌মা তাড়াতাড়ি রুয়ে যাত্রা করিল। যে উকিলের অফিসে লিওঁ কাজ করিত, সে তাহা জানিত। অফিসে ঢুকিতেই বৃদ্ধ উকিলটির সহিত দেখা হইল। বৃদ্ধ এম্‌মাকে সাদরে অফিসে লইয়া গেল। এম্‌মা উপায়ন্তর না দেখিয়া বৃদ্ধকে বিপদের কথা বলিল। কিন্তু বৃদ্ধ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহার সহিত প্রেমালাপেরই আয়োজন করিতে লাগিল।

ক্রোধে এম্‌মার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "আমার এই শোচনীয় অবস্থার সুবিধা নিতে আপনার লজ্জা হয় না?"

সেখান হইতে চলিয়া আসিতেই লিওঁর সহিত দেখা। আট হাজার ফ্রাঙ্কের কথা শুনিয়া লিওঁ বিস্ময়ে মাথায় হাত দিয়া বলিল, "পাগল হয়েছ নাকি? আমি টাকা পাব কোথায়?"

সত্যকারের একটা উন্মাদনা এম্‌মার সমস্ত দেহ ও মনকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। রুডল্‌ফের কথা ভাবিল। শেষবার সেইখানেই চেষ্টা করিবে। কিন্তু রুডল্‌ফ্‌ নূতন

করিয়া পুরাতন সম্পর্ক বাঁচাইতে রাজী আছে, কিন্তু টাকা দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব।

শ্রান্ত অবসন্ন পদে এম্‌মা যন্ত্র-চালিতের মত বাড়ী ফিরিয়া আসিল। চার্লস্ তখনও বাড়ী ফিরে নাই। এম্‌মা আপনার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পরের দিন গ্রামের চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল বিষপান করিয়া ডাক্তারের পত্নী এম্‌মা আত্মহত্যা করিয়াছে।

দিন তেমনি আর চলে না! চার্লস্ যেন সহসা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন ধরিয়া যে পৃথিবীতে সে সহজ আনন্দে বিচরণ করিয়াছে, যত দিন যায়, তাহার মনে হয় যেন সে তাহার কিছুই বোঝে না। আপনার ঘরে ছোট মেয়েটিকে লইয়া সে বিস্ময়ে দিন কাটায়। কেন যে এম্‌মা এমনি করিয়া চলিয়া গেল—সে যতই ভাবিতে যায়, ততই বুঝিতে পারে না।

সহসা একদিন পুরাতন আসবাব-পত্র ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে এক তাড়া চিঠি তাহার হাতে পড়িল। এ হস্তাক্ষর সে

তো কোনও দিন দেখে নাই! এ যে এম্‌মাকে লেখা! রুডলফের চিঠি এম্‌মার কাছে লেখা। একখানি একখানি করিয়া চার্লস্‌ চিঠিগুলি পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে আর পড়িতে পারিল না। সহসা যেন জরা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল—তাহার বিরাট দেহ পক্ষাঘাত-গ্রস্ত রোগীর মত পঙ্গু হইয়া গেল।

পরের দিন সকালে সেইঘরে সেই চেয়ারে আসিয়া চার্লস্‌ বসিল। ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে চাহিয়া আপনার মনে কি ভাবিতে লাগিল। অন্ধকারের দিকে চাহিয়া তাহার আঁখিপল্লব ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসিল।

মাতৃহারা সঙ্গীহীন মেয়েটি খেলিতে খেলিতে ছুটিয়া আসিয়া বাবাকে ডাকিল। সাড়া মিলিল না। হাত ধরিয়া টানিতেই চার্লস্‌ বোভারীর অসাড় মৃতদেহ মাটিতে পড়িয়া গেল।



কুৎসিতার প্রেম

সেদিন আমার এক বন্ধু বলছিল ঃ

সে এক অদ্ভুত মেয়ে।

ঘরের পাশেই মেয়েটি থাকে। ছোট্ট একটি ঘর। তখন আমি মস্কোয় পড়ি।

বাড়ী তার পোলাণ্ডে। নাম—টেরেসা। লম্বা, জোয়ান,—কালো চোখের ভুরুদুটি বেশ টানা-টানা; চেহারাটা কেমন যেন শয়তানী-গোছের। পাথর থেকে কুঁদে যেন বার-করা হয়েছে তাকে। চোখ-দুটো ভাসা-ভাসা, গলার আওয়াজ বেশ ঝাঁঝালো,—হাব-ভাব চাল-চলন দেখে মনে হয়, কারও সঙ্গে লড়্‌বে হয়ত। গাঁট্টা-গোট্টা ভারী চেহারা—ভয়ঙ্কর কুৎসিত।

চোর-কুঠরীর মত অন্ধকার ছোট-ছোট দু'খানি ঘর আমাদের ঠিক পাশাপাশি। মেয়েটা ঘরে আছে জানলে আমি আমার দরজা কখনও খুলতাম না।

হঠাৎ এক একদিন উঠোনে কিম্বা সিঁড়ির ওপর আমাদের দেখা হয়; দেখা হলেই সে আমার মুখের পানে তাকিয়ে কেমন যেন একটা অবজ্ঞার হাসি হাসে।

মাঝে-মাঝে দেখতাম সে বাড়ী এলো,—চোখদুটো লাল, চুলগুলো উস্কো-খুস্কো! এমন সময় চোখোচোখি হলেই বেহায়ার মতো মেয়েটা একদৃষ্টে আমার মুখের পানে চেয়ে থাকে; জিজ্ঞাসা করে, "কি গো! পড়ুয়া যে!"

তার দুষ্টু হাসি আমার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হয়।

মেয়েটাকে এড়াবার জন্যে অন্য ঘরে হয়ত উঠে যেতে পারতাম, কিন্তু জায়গাটা ভারী চমৎকার! শহর পর্য্যন্ত নজর চলে। সব-কিছু দেখা যায়। ভারী নির্জ্জন। পথের ওপর গোলমাল যেন একেবারে নেই বললেই হয়।

সকালে সেদিন কাপড়-চোপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে আছি—হঠাৎ দেখি, দরজাটা খুলে গেল।

চৌকাঠের ওপর টেরেসা দাঁড়িয়ে!

"কি গো পড়ুয়া !"

গলার আওয়াজ ভারি-ভারি।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ! কেন ?"

মুখের পানে তাকালাম। মুখের ওপর কেমন যেন একটা হতভম্বের মত লজ্জার ভাব। তেমনটি কখনও দেখিনি।

"দেখ,"—সে বললে, "একটুখানি দয়া করবে ? করবে ত ? না···"

বিছানার ওপর শুয়ে-শুয়েই ভাবলাম এ একটা ছল মাত্র। কথা বললাম না।

সে আবার বললে, "বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখতে চাই।"

তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে টেবিলের কাছে গিয়ে বসলাম। কাগজ নিলাম, কলম নিলাম, বললাম, "বল কি লিখতে হবে। বসো ওইখানে।"

ঘরে ঢুকলো। ধীরে ধীরে বসে' সে আমার চোখের পানে খুব খানিক্‌টা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কাকে লিখ্‌ব ?"

"বোল্‌স্‌লাফ্‌ কাস্‌পুট। স্বয়েন্‌জিয়ানীতে থাকে। রেলরাস্তার নাম ওয়ার্‌শ'।"

"কি লিখ্‌তে হবে ? বল—শীগ্‌গির বলে যাও।"

"ভাই বোল্‌স্ ! প্রিয় আমার—প্রিয়তম আমার—সোনা আমার—মাণিক আমার ! ভগবান তোমায় সুখে রাখুন ! টেরেসার এত দুঃখু হয়েছে,—সেই টেরেসা—যাকে তুমি একটি ছোট্ট ঘুঘুর ছানা বলে' আদর করতে—সেই তাকে তুমি একবারটি মনে করে' এতদিন ধরে' কেন কিছু লেখনি লক্ষ্মীটি ?"

আর একটু হলে তার মুখের ওপরেই হেসে ফেলেছিলাম। আহা, দুঃখে ম্রিয়মাণ ছোট এই ঘুঘুর ছানাটি—এরা মোটাসোটা লম্বা প্রায় ছ' ফুট, পালোয়ানের মত হাতের কব্জি, মুখখানি কালি-অন্ধকার,—'ঘুঘুটি' যেন সারা জীবনভোর শুধু চিম্‌নি সাফ করেছে !

কোনরকমে মুখখানা গম্ভীর করে' রেখে বললাম, "বোল্‌স্‌লাফ্‌টি কে ?"

সে একটুখানি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেল। বোল্‌স্‌লাফ্‌কে না-জানা—সকলের পক্ষেই সে-যেন এক অভাবনীয় ব্যাপার। বললে, "কার কথা বলছ ? বোল্‌স্ ? বোল্‌সের সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে যে !"

"বিয়ের ঠিক্ ?"

বললে, "অবাক্ হয়ে গেলে নাকি? থাকবে না? ভালবাসার লোক থাকবে না—আমার মত কমবয়েসী মেয়ের?"

'কমবয়েসী মেয়ে'—কি আশ্চর্য্য!

"হতে পারে," আমি বললাম, "সবই সম্ভব। কতদিন ধরে চলছে তোমাদের?"

"দশ বচ্ছর।"

যাক্।

তার হয়ে চিঠি ত একখানা লিখে দিলাম।

এম্‌নি করুণ করে লিখলাম চিঠিখানা, আর এত ভালবাসার কথা থাকলো তাতে যে, আমারই বোল্‌স্‌লাফ্‌ হ'তে ইচ্ছে করছিল; কিন্তু চিঠিখানা যদি টেরেসা ছাড়া আর-কোনও মেয়ের কাছ থেকে আসতো···

দেখে মনে হলো, টেরেসা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে। বললে, "কি বলে যে তোমাকে...আচ্ছা, তোমার জন্যে আমি কিছু করতে পারি কি?"

"না। কিচ্ছু করতে হবে না, যথেষ্ট হয়েছে।"

"দেখ, তোমার কাপড়-চোপড় আমি সেলাই করে' দিতে পারি!"

কথাটা ভারী বিশ্রী শোনালো। তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, তার কোনও সাহায্যের দরকার আমার হবে না।

তখন সে চলে গেল।

দু'হপ্তা পেরুলো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা জানালায় বসে বসে আপনমনেই শিস্ দিচ্ছি; ভাবছি, কি করা যায়। বাইরে বিশ্রী আবহাওয়া,—বেরোতে ইচ্ছে করে না।

হঠাৎ দরজা-খোলার শব্দ হলো।

ভাবলাম, কেউ আসছে হয়ত!

"তুমি কি খুব ব্যস্ত আছ?"

টেরেসা। আর কেউ হলে যেন ভাল হতো।

"না। কেন?"

"আর একটি চিঠি তোমায় লিখে দিতে হবে।"

"বোল্‌সের কাছে?"

"উঁহু! আমি তার জবাব চাই—"

বললাম, "সে কি!"

"দেখ, কিছু মনে করো না। বুদ্ধিসুদ্ধি আমার তেমন নেই। পরিষ্কার করে' আমি নিজেকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। ধর—এবার যেন আর আমার হয়ে নয়—

আমার এক বন্ধুর হয়ে;—বন্ধুও ঠিক নয়, পরিচিত। ধর—সে-লোকটি যেন লেখাপড়া কিছু জানে না—আমার মত একটি মেয়ে সঙ্গে ধর যেন তার বিয়ের কথাবার্ত্তা হয়েছে—”

মুখ তুলে তার মুখের পানে তাকালাম। তার লজ্জা হলো। কেমন যেন সে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। হাতদুটো তার কাঁপছিল। মনে হলো তার মনের ভাব আমি টের পেয়েছি।

বললাম, “বুঝেছি। সব তোমার মিছে কথা। তোমার কথা—বোল্‌স্‌লাফের কথা—সব তোমার মন-গড়া। এখানে আসবার জন্যে শুধু ছল খুঁজে বেড়ানো। যাও—তোমার জন্যে আমি আর কিছু করতে পারবো না—যাও!”

দেখলাম সে ভয় পেয়েছে। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো; কিছু বলবার জন্যে হাঁকুপাঁকু করছিল।

মনে হলো, মেয়েটাকে যেন ভুল বুঝলাম। বোধ হয় সেজন্যে আসেনি। আমাকে বিপথে নিয়ে যাবার ইচ্ছে বোধ করি ওর নেই। হয়ত আর কিছু...কিন্তু কি?

বললে, “শোনো”—বলেই কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বুকের মধ্যে আমার কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। সশব্দে তার দরজা বন্ধ করবার শব্দ আমার কানে এলো।...রেগেছে। ভাবলাম, ডেকে নিয়ে আসি মেয়েটাকে। চিঠি আমি ওর লিখে দেব। ভারী কষ্ট হলো মেয়েটির জন্যে।

গেলাম। হাতে মুখ রেখে টেবিলের কাছে বসেছিল সে।

বললাম, "দেখ,—"

কথাটা শুনবামাত্র মেয়েটা যেন লাফিয়ে উঠলো। চোখদুটো তার জ্বলছিল। হঠাৎ সে আমার কাঁধের ওপর হাত দিয়ে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলো। বুক যেন তার ভেঙে যাচ্ছে!

"কী এমন ক্ষতি হয় তোমার—ওই কটা লাইন—লিখে দিতে? সত্যি তুমি ভারী ভালমানুষ!—হ্যাঁ, ঠিক্ কথাই ত—বোল্‌স্‌লাফ্‌ ব'লে কেউ নেই—নেই-ত! টেরেসাও নেই। শুধু আমি—আমি শুধু—আমিই আছি।'

কথা শুনে হঠাৎ যেন আমি চম্‌কে উঠলাম।

"কি! কি বললে? বোল্‌স্‌ বলে কেউ নেই তাহ'লে?"

"না।

"টেরেসাও না?"

"না। আমিই টেরেসা।"

মাথাটা যেন ঘুরছিল। তার মুখের পানে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম।

টেবিলের কাছে সে ফিরে গেল; ড্রয়ার্‌টা টেনে ধরে একটা কাগজ সেখান থেকে বের করে আনলে।

আমার কাছে ফিরে এসে বললে, "এঁ,—এই নাও। আমার জন্যে যে চিঠিখানা লিখে দিয়েছিলে—এই নাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার সেই চিঠি।—আর তুমি লিখে দেবে না, কেমন? না দাও, অনেক লোক আছে—এ দয়াটুকু যারা অনায়াসে করবে।"

বোল্‌স্‌লাফের জন্যে যে, চিঠিখানা আমি লিখে দিয়েছিলাম সেটা তখনও তার হাতে, ব্যাপার কি? বললাম,

"শোনো টেরেসা, এ সবের মানে কি বল ত? এ চিঠিখানা এখনও তুমি পাঠাওনি; আর এরই মধ্যে আবার তুমি চিঠি লেখাতে চাও কেন বল দেখি?"

"কার কাছে পাঠাব চিঠি?

"কেন, বোল্‌স্‌লাফের কাছে—"

"কিন্তু সে নামের লোক ত কেউ নেই।"

এবার আমার চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু সে আবার বললে, 'না, বোল্‌স্‌লাফ বলে কেউ নেই।—এমন ভাবে কথাটা বললে, মনে হলো যেন বলতে তার কষ্ট হচ্ছে। 'কিন্তু আমি চাই সে থাকুক, আমি কি—তা আমি জানি। আর সব কারুর মত আমি নই। কিন্তু তবু যদি আমি তাকে লিখি ত' কার কি আসে যায় ?'

"কাকে ? কি বলছ তুমি ?"

"বোল্‌স্‌লাফকে।"

আমার মাথার ভেতরটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। "বা, এখনই যে বললে—সে নামের কেউ নেই ?"

"ও মা ! নাই-বা থাকলো ! তাতে আমার কি ? নেই, তা আমি জানি। আমি কিন্তু মনে মনে ভাবি বোলস্‌লাফ্ বলে যে হোক্-কেউ আছে। আছে মনে করে চিঠি লিখি সেও জবাব দেয়। আবার লিখি—আবার জবাব দেয়।"

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝলাম। ভাবলাম সত্যি অপরাধ করেছি। লজ্জা হলো। সর্ব্বাঙ্গে যেন বেদনা বোধ করছি। আমারই পাশে হাতের কাছে একান্ত সন্নিকটে এমন এক বেচারা মানুষ বাস করে—

সারা তুনিয়ার মধ্যে এতটুকু স্নেহমমতা করবার যার আর কেউ নেই ;—মা বাপ নেই—বন্ধু নেই—কেউ নেই ! আর তাই সে অভাগী আবিষ্কার করেছে—মনে-মনে শুধু আবিষ্কার করেছে এমন একজন লোক—যে তাকে অন্তত ভালবাসতে পারে—যেন তার বর—সে যেন তার স্বামী !

মেয়েটি আবার তার সেই একঘেয়ে গম্ভীর গলায় বলে যেতে লাগলো, "এই যে চিঠিখানা তুমি বোল্‌স্‌-লাফ্‌কে লিখে দিয়েছিলে, আর একজনকে বলেছিলাম, বলি, পড়—খুব জোরে-জোরে পড় ত' চিঠিখানা !... আমি শুনেছিলাম আর ভাবছিলাম, বোল্‌স্‌লাফ আছে। তাই আমি তোমাকে আবার বলেছিলাম এর একটা জবাব লিখে দিতে—বোল্‌স্‌ যেন তার টেরেসাকে লিখছে,—তার মানেই, আমাকে। আমার ঠিক মনে হয় বোলসলাফ্‌ আছে। কোথায়—ঠিক তা জানি না। তবে মনে হয়, আছে কোথাও।—নিশ্চয়ই। আর সেই ভেবেই ত' আমি টিকে আছি কোন রকমে। এখন আর তাই বেঁচে থাকা আমার পক্ষে খুব যে একটা শক্ত কাজ—তা নয়। একা থাকি, তা যেন মনেই হয় না।"

তারপর,—

তারপর, সেইদিন থেকে, হপ্তায় ঠিক দুবার করে' আমি তার চিঠি লিখে দিয়েছি। টেরেসা যেন বোল্‌স্‌কে লিখ্‌ছে, আর বোল্‌স্‌ টেরেসাকে। চিঠিগুলো এম্‌নি অনুরাগের সঙ্গে লিখতাম—এত ভাল করে'—বিশেষত জবাবগুলো। আর ওই মেয়েটি,...শুনতো, আমি পড়তাম। সে কাঁদতো,—ফুলে' ফুলে' কাঁদতো, হাসতো,—ভারি খুশী হতো।

এর বদলে সে আমার কাপড়-চোপড়গুলো দেখা-শোনা করতো, ছেঁড়া মোজা, ছঁড়া কামিজ সেলাই করে' দিত, জুতোগুলো পরিষ্কার করতো, আর ধুলো ঝেড়ে' টুপি সাফ্‌ করে' দিত।

মাস-তিনেক পরে কি যেন সন্দেহ করে' পুলিস তাকে ধরে' নিয়ে গেল, তারপর জেল্‌খানায় পুরে রাখলে।

পরে আর তার দেখা পাইনি।

বোধ করি এতদিন মরে গেছে।



ধূম-কুণ্ডলী

শ্লাভের অন্তরে যে সুন্দর বিষণ্ণতা আছে, টুর্গেনিভ তাহারই কবি। অন্য সমস্ত রুষ-সাহিত্যিক হইতে সেইখানেই তাঁহার পার্থক্য। তাঁহার সমস্ত নভেলে তিনি প্রেমের পুষ্প-দেউলই রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সকল সাহিত্যের সেই মূল সুর। এখানে তাঁহার বিখ্যাত নভেল "স্মোকে"র গল্পাংশ পাঠকদিগের নিকট নিবেদন করিলাম। ইহাকে অনায়াসে জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেম-কাহিনী বলা যায়।

উনবিংশ-শতাব্দীর মধ্যভাগ। মস্কো শহর। শহরের একদিকে রুষিয়ার রাজবংশের একটী বিশিষ্ট শাখা অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় বাস করে। রাজ-প্রাসাদ হইতে কোনও কারণে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ, মহামান্য রুরিকের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও যুবরাজ ওসেনিনদের দারিদ্র্যের তিক্ততম

গ্লানি ভোগ করিতে হয়। অতীতের স্মৃতি ও নামের পূর্ব্বে রাজবংশের পরিচয় ব্যতীত মহাকাল আভিজাত্যের সমস্ত নিদর্শন অপহরণ করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু আভিজাত্য সহজে মরিতে চায় না। বাহিরের সমস্ত আভরণ বিলুপ্ত হইয়া গেলেও, অন্তর হইতে তাহার প্রভাব যাইতে চায় না। হৃত-গৌরব আভিজাত্যের গর্ব্ব আরও বেশী। তাই ওসেনিন্‌-পরিবারের লোকেরা মহাকালের ও সম্রাটের অবিচারের প্রতিহিংসা নিজেরাই নিজেদের স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসনের দ্বারা চরিতার্থ করিত।

কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে সকলকেই মরিতে হয়। যত দীপ জ্বলে, তত দীপ নিভে। অনাদি অন্ধকারের তরঙ্গে শুধু আলোর ফেনা মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠে।

আভিজাত্যও মরে। তাহাকেও ভিক্ষা করিতে হয়। ওসেনিন্‌-পরিবারেরও তাহাই হইল। পুরাণো-কালের বহুমূল্য পোষাক পরিয়া মুদীর দোকান হইতে ধারে তাহাদেরও জিনিষ আনিতে হয়। দাম পড়িয়া থাকে। আইভী-লতা দিয়ে ঘেরা পুরাণো-আমলের বসত বাটীর দরজার ভিতরে, সিংহের-মূর্ত্তিওয়ালা গেটের মধ্যে, মাঝে মাঝে পাওনাদারদের তাগাদার তিক্ত ধ্বনিও শোনা যায়। পাথরের সিংহমূর্ত্তি তেমনি স্থির হইয়া থাকে,

কিন্তু মানুষের পাথরের মন টলিয়া উঠে। লোভ হয়, মোহ আসে, কোনও রকমে কি আবার রাজ-প্রসাদ লাভ করা যায় না ?

গোপনে অনেক লোকের নিকট ঋণ বলিয়া টাকা লইতে হয়। অর্থের বিনিময়ে অনেক সময় কৃতজ্ঞতা দিয়া ঋণ শোধ করিতে হয়। যাহারা ঋণ দিয়া উপকার করে, তাহাদের নিকট লজ্জিত হইয়া থাকিতে হয়। এই লজ্জা আক্রোশের রূপে মনে জমা হয়।

লিটভিনফ্ একবার এই পরিবারকে কিছু অর্থ সাহায্য করে এবং সেই ব্যাপার হইতে সে প্রায়ই এই বাড়ীতে আসিত। টাকা আদায়ের জন্য নয়, কৃতজ্ঞতার সুবিধা লইবার জন্য নয়, তাহার আসিতে ভাল লাগিত। ইরিণার রূপ তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ইরিণার কালো চোখের আলো যুবকের চিত্তে প্রেমের শত বহ্নি-শিখা জ্বালাইয়া দিয়াছিল।

ইরিণা বাড়ীর বড় মেয়ে। এখনও সে কুমারী। হয়ত তাহার বিবাহের মধ্য দিয়া আবার তাহারা কোনও দিন পূর্ব্বকার গৌরব ফিরাইয়া পাইতে পারে।

ষোলো বৎসর পার হইয়া ইরিণা সতেরোয় পড়িয়াছে। সে সুন্দরী, উষার মত সুন্দরী। পিছনে

তার ঘন কালো চুলে নিশীথের অন্ধকার। চোখে তার উদাসীন দৃষ্টি, হাসি তার অস্পষ্ট, দোলায়মান চিত্তের অস্থিরতায় ভরা। কখনও কখনও হাসির রূপ বদলায় —সে জানে না, সে হাসি সর্ব্বনাশ আনে, তার এবং আরও অনেকের।

ইরিণা জানিত যে, আর কাহারও সর্ব্বনাশ হউক বা না হউক লিটভিনফের হইয়াছে। লিটভিনফ্ উন্মাদ —সেই নয়নের একটুকু দৃষ্টির প্রসাদের জন্য সে উন্মাদ! কিন্তু ইরিণা ফিরিয়াও চাহে না। নিষ্ঠুর আঘাতে লিটভিনফের হৃদয় ভাঙ্গিয়া দেয়। লিটভিনফ্ যত আবেদন করে, ইরিণা তত কঠোর প্রত্যাখ্যানে তাহার অপমান করে।

এমনি করিয়া দিন যায়। একদিন সহসা লিটভিনফের প্রেমের অধ্যবসায় ভাঙ্গিয়া গেল। সে স্থির করিল, এ খেলা ভাঙ্গিতে হইবে। পাষাণকে পূজা করিয়া লাভ কি?

প্রতিদিন রাত্রে চলিয়া যাইবার সময় যেমন বিদায়-সম্ভাষণ করিতে হয়, সেদিন রাত্রে সেরূপ কোনও সম্ভাষণ না করিয়া, ক্রোধে ও অভিমানে লিটভিনফ্ বাহির হইয়া পড়িল।

বাহির হইতেই দেখে, কোমল সংহৃত কণ্ঠে কে যেন বলিতেছে, "যেও না, দাঁড়াও!"

লিটভিনফ্ ফিরিয়া দেখে, ইরিণা! আঁখি-পল্লবে এ কি অভিনব আহ্বান-লিপি!

"যেও না! আজ আমার পরাজয়ের রজনী! জয় করে' একা তো যেতে পারবে না।"

বিস্ময়ের সহিত মিশিয়া প্রেম সুরার চেয়েও তীব্র মাদক হইয়া উঠে। সে যত দুর্লভ, সে যত অপ্রত্যাশিত তার মাদকতা তত গভীর। লিটভিনফ্ তাহা বুঝিল, আর বুঝিল তাহার দেহের সমস্ত রক্তবিন্দু! এ কি সুন্দর, এ কি অপূর্ব্ব! এ কি মধুর ছলনা! একদিন যাহার করুণা শত ভিক্ষাতেও মিলে নাই, এ কি আজ তার করুণাময়ী মূর্ত্তি! লিটভিনফ্ ইরিণার প্রেমে সমস্ত সত্তা বিলুপ্ত করিয়া দিল।

দিন যায়, স্বপ্নের মত। দিন আসে আশীর্ব্বাদের মত।

কোথা থেকে অকস্মাৎ এলো ঝড়—অকাল-বৈশাখীর

মত। মস্কোর রাজ-প্রাসাদে প্রতিবৎসর রাজ-পরিবারের ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এক বিরাট ভোজ ও নৃত্যসভা হয়—রূপের, ঐশ্বর্য্যের, বিলাসের বাৎসরিক উৎসব।

ওসেনিন্-পরিবারের লোকেরা কি ভাবিয়া স্থির করিল, এ উৎসবে তাহারা এবার যোগদান করিবে। ইরিণার যাওয়া চাই-ই।

ইরিণা কিন্তু যাইতে নারাজ। ওসেনিন্‌রা লিট-ভিনফের শরণাপন্ন হয়। বলে, তুমি বুঝিয়ে বল্লেই ও যাবে।

লিটভিনফের মনে শঙ্কা জেগে উঠে। কিসের ধূম-কুণ্ডলী তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

তবুও তাহাকেই অনুরোধ করিতেই হইল।

"আমি যাব—কিন্তু মনে রেখো, তুমিই আমাকে যেতে বাধ্য করেছ—"

এ অনুযোগের অর্থ লিটভিনফ্ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না! বলে, "ইরিণা, রাগ করো না মণি,—"

"রাগ নয়—রাগ নয়—তুমি জান না, বোধ হয়, কেন নিশ্চয়—"

"তুমি তো আমায় ভালবাসো? বলো, বলো, ইরিণা?"—

পুরুষের মত কঠিন ভাবে ইরিণা লিটভিনফের হাত জড়াইয়া ধরে। বলে, "হাঁ গো হাঁ।"

লিটভিনফের দেওয়া হেলিওট্রোপ ফুলের গুচ্ছ অঙ্গে আভরণ করিয়া ইরিণা রাজসভায় যায়।

পরের দিন। লিটভিনফ্ আসিয়া শুনিল, ইরিণা অসুস্থ হইয়াছে। সে কাহারও সহিত দেখা করিতে চায় না। তবে গত-রজনীর নৃত্য-সভায় তাহার রূপ সমগ্র মস্কো শহরকে সম্মোহিত করিয়াছে। স্বয়ং জার পঞ্চমুখে তাঁহার রূপের প্রশংসা করিয়াছেন।

পরের দিনও দেখা হইল না। ধূম-কুণ্ডলী তাহার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল!

অচৈতন্যের মত সে বাহির হইল। সমস্ত জিনিষই তাহার দুর্ব্বোধ্য লাগিল। এ আবার কি অভিনব রূপ! দরজায় একটা বৃহৎ মোটর দাঁড়াইয়া!

যে-কথা বুঝিলে সমস্ত জিনিষই সহজ হইয়া যায়, ব্যথিত চিত্ত সে কথাটাই বুঝিতে চায় না।

পথে আসিতে ভৃত্য আসিয়া একখানি পত্র দিল। পত্রে লেখা,—

"আমাকে ক্ষমা করো, তুমি। তোমার আমার মধ্যে সমস্ত সম্বন্ধ শেষ। আমি আজই সেণ্টপিটর্সবার্গ চলে যাচ্ছি। বিশ্বাস করো, আর নাই করো, আমার চিত্ত আজ মুমূর্ষু। তবুও উপায় নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। আমি আমার দোষ-স্খালনের কোনও চেষ্টা করবো না তোমার কাছে। তোমার একান্ত অযোগ্যা—ইরিণা।

"আমার শেষ অত্যাচার—আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করো না। তোমার মহত্ত্ব দিয়ে আমার এ অনুরোধ তুমি রাখবে।"

বহুকাল ধরিয়া মানুষ রাজনীতির ব্যবসায়ে রূপকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। ইরিণার রূপ দেখিয়া তাহার এক আত্মীয় রুষ-রাজনীতিতে ইহাকে কাজে লাগাইবার জন্য, ইরিণাকে সেণ্টপিটর্সবার্গে লইয়া গেল।

লিট্‌ভিনফের সমস্ত জীবনের সূত্র যেন হারাইয়া গেল। পড়াশোনা সমস্ত ত্যাগ করিয়া সে গ্রামে ফিরিল। মাঝে মাঝে ইরিণার খবর সে পাইত। শেষ খবর সে পাইল—বিখ্যাত জেনারেল র‍্যাটমিরভের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

এই ঘটনার পর প্রায় দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসর লিট্ভিনফ্ কখনও সৈনিক হইয়া, কখনও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইয়া নানাস্থান ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

প্রথম যৌবনের প্রেমের যে আঘাত সর্ব্ব দেহমনে দাগ দিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর ধীরে ধীরে তাতিয়ানার প্রেমের প্রলেপ আঘাতের চিহ্নকে বিলুপ্ত করিয়া দিতেছিল। তাতিয়ানা লিটভিনফের দূর-সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ার কন্যা; এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথাবার্ত্তা সমস্ত স্থির হইয়া যায়।

জার্ম্মানীর ব্যাডেন নগরে সমস্ত দেশের লোকেরা সমবেত হয়। লিটভিনফ্ ব্যাডেনে আসিয়া, উপস্থিত হইয়াছে। দুই উদ্দেশ্য—ভ্রমণ এবং তাতিয়ানার সহিত মিলন; কারণ তাহাদেরও ব্যাডেনে আসিবার কথা আছে।

ব্যাডেনের হোটেল রুষ-রাজনীতিক যুবকদের আড্ডা। যুবকদের মজ্লিসে লিটভিনফ্ যোগদান করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার মন বসে না। বিদেশে বসিয়া সুরা-পাত্রের সম্মুখে তাহারা দেশের মুক্তি সম্বন্ধে বচসা করে, মদের ফেনার সহিত কথার ফেনা মিশে যায়।

লিটভিনফের ভাল লাগে না। হোটেল ছাড়িয়া পদব্রজে সে পার্ব্বত্য-প্রদেশের মধ্যে বেড়াইয়া বেড়ায়। আর তাহার অন্তর অপেক্ষা করে কখন তাতিয়ানা আসিবে।

একদিন পরিভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া লিটভিনফ্ এক পুরাণো কাসেলে অবস্থিত এক পান্থাবাসে বসিয়া আহার করিতেছে। এমন সময় দেখে, একদল রুষ-আভিজাত্য-শ্রেণীর লোক সেই পান্থাবাসে প্রবেশ করিল।

আহার শেষ করিয়া লিটভিনফ্ যখন বাহির হইতে-ছিল, তখন শুনিল নারী-কণ্ঠে তাহার নাম ধরিয়া কে যেন ডাকিতেছে।

বিস্ময়ে ফিরিয়া দেখে ইরিণা!

'লিটভিনফ্, আমাকে চিন্‌তে পার?'

দশ বৎসর পরে এ কি আহ্বান?

বিমূঢ় হইয়া লিটভিনফ্ বলিয়া উঠিল, "ইরিণা, ইরিণা—"

"ভোলোনি, ভোলোনি, তা হলে—

নারীর কপোলে লজ্জা।

এমন সময় ইরিণার স্বামী সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইতে ইরিণা সপ্রতিভ হইয়া লিটভিনফের সহিত তাহার স্বামীর পরিচয় করাইয়া দিল। লিটভিনফের সমস্ত

শরীর তখন কাঁপিতেছিল। অভিজাতদের দেখিয়া তাহার অভিমান আক্রোশে পরিণত হইয়া উঠিল। কোনও রকমে ইরিণা ও তাহার স্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সে ছুটিয়া বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া সে অকারণে খুব দ্রুত চলিতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ইরিণার নিকট হইতে একজন দূত আসিল। ইরিণা তাহাকে দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে।

দশ বৎসরের দুর্ব্বহ ব্যবধান – সূর্যোদয়ে ধূম-কুণ্ডলীর মত সরিয়া গেল! মন্ত্রমুগ্ধের মত লিটভিনফ্ ইরিণার সহিত দেখা করিতে বাহির হইল।

আবার দেখা হইল। কাতর-কণ্ঠে নারী কহিল, "বহুদিন পরে আবার এই আমরা দুজনে একলা—তোমাকে পেয়ে আমার যে আজ কি আনন্দ—অন্ততঃ তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার সুবিধে পেলাম—"

পুরুষ। চমকাইয়া'উঠে। কোনও রকমে বলে, ক্ষমা? ক্ষমা কিসের?"

"কিসের? তোমাকে কি নিষ্ঠুর আঘাতই না দিয়েছি? কিন্তু তার চেয়েও নিষ্ঠুর আঘাত ভাগ্য আমাকে দিয়েছে।"

লিটভিনফ্ চাহিয়া দেখে, ইরিণার দুই চোখে জল। শিশির-সিক্ত উষার মত ইরিণা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। "কিছু মনে করবো না আমি--কিছু মনে রাখবো না। একদিন তুমি তোমার ভালবাসা দিয়ে আমাকে যে কি ঋণী করে গেছ—সেই কথাই শুধু মনে রাখবো।"

তারপর কত কথা হয়। দশ বৎসরের দীর্ঘ কাহিনী পত্র-পুষ্প-পল্লবে আবার ফুটিয়া উঠে।

বিদায়ের সময় সহসা ইরিণা বলিয়া উঠে—"একটা কথা তো আমায় বল্লে না—

"কি কথা ?"

"তোমার বিয়ের নাকি সব ঠিক হয়ে গেছে ?"

লিটভিনফের মুখ চোখ সমস্ত রক্তিম হইয়া উঠিল, কি মনে করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, ঠিক হয়ে গেছে, শীগ্গিরই হবে।"

রাস্তায় বাহির হইয়া সে আপনার মনকে সহস্র রকমে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, আর সে ইরিণার সহিত দেখা করিবে না। পরের দিন সমস্ত পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে আপনার মনে সেই কথাই জপিতে লাগিল। সহসা পথে দূরে দেখে ইরিণা আসিতেছে। দেখিয়াও দেখে নাই এইরূপ ভান করিয়া লিটভিনফ্ অন্য পথ ধরিয়া

চলিয়া গেল। সমস্ত দিন পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইল। ফিরিবার সময় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। পথের ধারে অন্ধকারে সহসা দেখে, এক নারীমূর্ত্তি বসিয়া, তাহাকেই আহ্বান করিতেছে।

লিটভিনফ্ আগাইয়া গিয়া দেখে, ইরিণা।

তোমার জন্যেই বসে আছি—বস' দু-দণ্ডের জন্য—

লিটভিনফ্ সমস্তই খুলিয়া বলিল। অনেক বুঝাইল। তাহার সঙ্গ তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। ইরিণা অনুরোধ করিল। বন্ধু হইতে আপত্তি কি ?

সেদিন রাত্রে বাড়ী আসিয়া লিটভিনফ্ তাতিয়ানা ছবি বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিয়া সারারাত্রি নিজের অন্তরের সহিত সংঘর্ষকরিল।

প্রভাতে সে দেখো সায়ারাত্রি ইরিণার কাছে যাইবারই চেষ্টা করিয়াছে।

মুক্তি নাই—ইরিণার নিকট হইতে মুক্তি নাই। তাহার সমস্ত রক্ত সেই ছন্দে নাচিয়া উঠিয়া তাহার অন্তরের অনুমোদন জ্ঞাপন করিল।

পরের দিন আবার দেখা। লিটভিনফ্ রাত্রির সমস্ত যন্ত্রণার কথা ইরিণাকে নিবেদন করিল। মুক্তি নাই—দুজনার নিকট হইতে দুজনার মুক্তি নাই।

নতজানু হইয়া লিটভিনফ্ ইরিণার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল। লিটভিনফ্‌কে হাত ধরিয়া তুলিতে গিয়াই সহসা ইরিণা বলিয়া উঠিল "না না—তুমি যাও, তুমি চলে যাও, চলে যাও, আমার সম্মুখ থেকে—"

সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া লিটভিনফ্ স্থির করিল সে ব্যাডেন ছাড়িয়া যাইবে। আপনার মনে সে জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিল। এমন সময় ভৃত্যের হাতে আবার চিঠি। ইরিণা লিখিয়াছে—

"একদিন-না-একদিন যাহা হয় হইবেই—তাহাকে আর এড়াইয়া রাখিতে পারি না। আমার জীবন তোমার হাতে তুলিয়া দিলাম। তুমি যেখানে যাইবে ছায়ার মতন সেখানে যাইব। কাল দেখা হওয়া চাই-ই।"

জিনিষ-পত্র তেমনি আগোছালো অবস্থাতেই পড়িয়া রহিল। পরের দিন সকালে তাতিয়ানা আসিল। ষ্টেশনে তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে তাহার লজ্জা নয়, ভয় হইতেছিল। কয়েক দিনের মধ্যে তাহার সমস্ত বদলাইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর ধরিয়া অন্তরের যে শান্তি সে গড়িয়া তুলিয়াছিল, দশ দিনে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল।

হোটেলে প্রবেশ করিবামাত্র ভৃত্য আসিয়া একটী

পত্র দিল। ইরিণার পত্র। "সন্ধ্যার সময় অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্য আসা চাই।"

বিহ্বলের মত সে চলিতে-ফিরিতে লাগিল। সকলের নিকট হইতে অবসর লইয়া তাতিয়ানা সন্ধ্যার নির্জনে লিটভিনফকে একা পাইল। বহুদূর হইতে সে তাহার প্রিয়তমকে একান্তভাবে পাইবার আশা জপিতে জপিতে আসিয়াছে। কিন্তু তাতিয়ানার মনে শঙ্কা জাগে, প্রিয়তমের মুখে সে আনন্দ-রবি-রশ্মি কই ?

তাতিয়ানা কোনও প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বেই লিটভিনফ্ বলিয়া উঠিল, আজ সন্ধ্যায় এখুনি এক জায়গায় যেতে হবে—না গেলেই নয়—

তাতিয়ানা লিটভিনফের মুখের দিকে চাহিতে লিটভিনফ্ লজ্জায় ও ভয়ে মুখ নীচু করিল—কোন কথা বলিতে পারিল না। তাতিয়ানাও কোন কথা বলিল না। যে-কথা বুঝিতে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া-যাইতেছিল, সে-কথা নারীর অন্তরের অনুভূতি দিয়া সে যেন বুঝিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে লিটভিনফ্ ইরিণার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সমস্ত মন ও মস্তিষ্ক এক ধূম-কুণ্ডলীতে আচ্ছন্ন। সে জানে না সে কি করিতেছে বা কি বলিতেছে।

"তোমাকে ছেড়ে ইরিণা এক মুহূর্ত্তও তো বেঁচে থাকতে পারবো না। I can only breathe at your feet."

ইরিণা বলে, "আমিও তাই। যা হয় হোক্—যাক সব—তুমি যা বলবে, যেখানে যেতে বলবে সেখানেই যাব—"

মনে পড়ে তাতিয়ানার মুখ—ধোঁয়ার মধ্যে প্রভাতী তারার মত! লিটভিনফের বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ী পিটিতে লাগিল। সে যেন আবার অন্ধকারের মধ্যে, আবর্ত্তের মধ্যে চলিয়াছে—এবং সেই সঙ্গে আর একজনকে সেই আবর্ত্তে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। অপরের জীবনকে এরূপ আবর্ত্ত-সঙ্কুল করিবার তাহার কি অধিকার আছে? তাতিয়ানাকে সে সমস্ত বলিবে—তাহার কাছে সে মুক্তিভিক্ষা করিবে—নতুবা—

ক্ষিপ্তের মত সে ইরিণার বন্ধন-মুক্ত হইয়া পালাইতে চেষ্টা করিল। তাহার এই প্রচেষ্টায় তাহার নিজেরই হাসি পাইতে লাগিল। কিন্তু হাসিতে গিয়া তাহার চোখ বাষ্পে ভরিয়া উঠিল।

তাতিয়ানার সহিত সে সহজ হইয়া কথা বলিতে পারে না। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সে মাথা তুলিতে পারে

না। যে-কথা সে বলিতে যায়, তাহাই মিথ্যা হইয়া তাহার মনে আঘাত করে। তাতিয়ানা বোঝে। প্রত্যেক নারীই বোঝে।

এই আত্ম দহনের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য একদিন লিটভিনফ্ স্থির করিল সে সমস্ত কথা তাতি-য়ানাকে বলিবেই বলিবে। তাহার পর যাহা হয় হোক।

তাতিয়ানা প্রথম দিন হইতেই প্রস্তুত ছিল। এক-দিন নির্জ্জনে পাইয়া লিটভিনফ্ অপরাধের স্বীকারোক্তির ভূমিকা কোনও রকমে করিতে-না-করিতেই মহিয়সী সম্রাজ্ঞীর মত তাতিয়ানা সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল—

"আমার মুখ দিয়েই তুমি তোমার মুক্তির ছাড়পত্র চাও! কিন্তু কি ভাবে চাইবে সেইটে বুঝতে পারছো না, না? তুমি আমাকে আর ভালবাসা না এই কথাটাই তোমার বলতে বাধছে না?"

আচ্ছন্নের মত লিটভিনফ্ তাতিয়ানার পায়ের উপর পড়িয়া গেল। অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমাকে ক্ষমা কর তাতিয়ানা—আমি ক্ষমারও অযোগ্য—"

"তুমি যাকে ভালবাস, তাকে তোমার পাওয়া চাই।

আমার জন্যে তোমার শুধু মনে সঙ্কোচ লাগ্‌ছে, না? তুমি চলে যাও যত শীগ্‌গির পারো—আমার নারীত্বের অভিমানটুকুকে আর খর্ব্ব করো না—"

সেই দিনই তাতিয়ানারা ব্যাডেন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

লিটভিনফ্‌ ও ইরিণা ঠিক করিল, তাহারা দুইজনে পলাইয়া কোনও দূর-দেশে চলিয়া যাইবে। ট্রেনের সময় ঠিক হইল। লিটভিনফ্‌ জিনিষ-পত্র আবার গুছাইতে লাগিল।

যাত্রা করিবার মুখে ভৃত্য আসিয়া একখানি পত্র দিল। ইরিণার পত্র। সে লিখিয়াছে,—

"প্রিয়তম, আমি এ বন্ধন কাটাইয়া পলাইতে পারিলাম না। যত চেষ্টা করি, ততই দুর্ব্বল হইয়া পড়ি। কে আমাকে যেন পিছনে ধরিয়া রাখিয়াছে। যে জীবনের মধ্যে আজ আছি তাকে সহসা ছেড়ে যেতে সাহস পাচ্ছি না; অথচ জানি না এই জীবনের মধ্যে তোমাকে ছাড়া থাকবোই বা কি করে? জানি, তুমি আমাকে দুর্ব্বল-চিত্ত নারী বলে ঘৃণা করবে—তবুও অনুরোধ করি, এস, একবার এস, দেখা করতে—"

লিটভিনফের মনে হইল, সহসা সমগ্র পৃথিবীতে ঝড়

উঠিয়াছে। কোথাও কোনও জনপ্রাণী নাই। সে-ঝড়ের মধ্যে একা চলিয়াছে সে।

কখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, সে জানে না। ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিয়াছে, গাড়ীতেও উঠিয়াছে। গাড়ী ছাড়িবার সময় মনে হইল, কে যেন তাহার জন্য ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে। মুখ বাড়াইতেই দেখে—ইরিণা।

অবশের মত সে হাতের সঙ্কেতে গাড়ীতে উঠিবার জন্য আহ্বান করিল। ইরিণার চোখ মিনতিতে ভরা; সে দৃষ্টি বলিতেছে, নামিয়া এস।

তখনও সময় ছিল; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

এক-বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পাপী যেমন মন্দিরে প্রবেশ করিতে ভয় পায়, তেমনি লিটভিনফ্ তাতিয়ানাদের সংবাদ লইতেও ভয় পায়। তবুও লইতে হয়।

ধীরে ধীরে ভয়ের প্রদীপে মথিত-প্রেমের মৃদু শিখা জ্বলিয়া উঠে। আর একজনের মধ্যবর্ত্তিতায় লিটভিনফ্ তাতিয়ানাকে পত্র লিখিবার অনুমতি পাইল। শিখা আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। লিটভিনফ্ দর্শনের

অনুমতি ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিলেন। আবেগ-হীন ভাষায় ক্ষুদ্র উত্তর আসিল, "তোমার প্রয়োজন বোধ হইলে তুমি আসিতে পার।"

একান্ত অপরাধীর মত লিটভিনফ্ একদিন আবার তাতিয়ানাদের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাতি-য়ানার কাকীমা সাদরে অপরাধীকে আহ্বান করিয়া ঘরে লইয়া আসিলেন।

ঘরে ঢুকিয়াই তাতিয়ানাকে দেখিয়া লিটভিনফ্ নত-জানু হইয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল চুম্বন করিতে লাগিল।

অশ্রুজলে সে আর কিছু দেখিতে পাইতেছিল না।

তাতিয়ানা হাত ধরিয়া তুলিতে গেল। লিটভিনফ্ উঠিল না—"বল, বল, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ—"

কাঁদিয়া উঠিয়া তাতিয়ানা ডাকে, "কাকীমা, দেখো না—এ কি?"

স্নিগ্ধ হাসিয়া কাকীমা বলেন, "বাধা দিস্‌নে তাতি-য়ানা, ওকে কাঁদতে দে। ঐ অশ্রুজলে ওর প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে।"

সমাপ্ত